সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি ২০২৪

প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৪

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ সকালে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নির্বাচনী বিজয় উপলক্ষ্যে ভারত সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদির পক্ষ থেকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর সরকারের নতুন মেয়াদে একে অপরের জাতীয় উন্নয়নের সমর্থনে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারত্বের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী গতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ১৫ জানুয়ারি ২০২৪-এ বাংলাদেশের নতুন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। বাংলাদেশ সরকারের নতুন মেয়াদে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নিতে তারা নানান বিস্তৃত বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমি ২৯ জানুয়ারি মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মাকে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসের স্পেশ্যালাইজড ডিপ্লোম্যাটিক ট্রেনিং কোর্সসমূহ (এসডিটিসি) ও প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি (পিএমআইআরডি)-র বর্তমান ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ২৬ জানুয়ারি ২০২৪-এ তার চ্যান্সারি প্রাঙ্গণে ভারতের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করেছে। মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্য পাঠ করেন। বাংলাদেশে অবস্থানকারী বিপুল সংখ্যক ভারতীয় এই উদ্‌যাপনে যোগ দেন।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫২ | সংখ্যা ০১ | পৌষ-মাঘ ১৪৩০ | জানুয়ারি ২০২৪

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
পশ্চিমবঙ্গ

অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা বর্তমান প্রাদেশিক রাজধানী মানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। কোলকাতা একটি মেট্রোপলিটন শহর। পূর্ব ভারতে অবস্থিত দেশের চতুর্থ জনবহুল রাজ্য।

সূচিপত্র

কর্মযোগ	প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৪ ০২
প্রচ্ছদরচনা	কালে-কালান্তরে ভারতের সাধারণতন্ত্র ॥ গৌতম রায় ০৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি	সমকালীন প্রেক্ষাপট ও মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শন ড. শিপ্রা সরকার ০৮
	পূর্ববঙ্গে নেতাজি সুভাষ ॥ আশরাফুল ইসলাম ১১
প্রয়াণ	উস্তাদ রশিদ খান গান্ধর্বের মূর্তরূপ ॥ ড. সাইম রানা ১৬
	দেবারতি মিত্রের কাব্যজগৎ ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৭
দ্বিশতজন্মবর্ষ	ঢাকায় মধুসূদন ॥ বিভূতিভূষণ মণ্ডল ১৯
অনূদিত গল্প	বটবাবা ॥ ফণীশ্বরনাথ রেণু মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : সফিকুন্নবী সামাদী ২২
পঙ্‌ক্তিমালা	সুনীল শর্মাচার্য ॥ তুষার দাশ ॥ গৌতম মণ্ডল ॥ রবীন্দ্র নাথ অধিকারী অনুপ মণ্ডল ॥ প্রীতি আচার্য ॥ হাদিউল ইসলাম ॥ তৌফিক জহুর রিঙকু অনিমিখ ॥ সাদাত হোসাইন ॥ আজিজ কাজল স্নেহাংশু বিকাশ দাস ॥ আদ্যনাথ ঘোষ ॥ অনু ইসলাম ॥ রনক জামান সিদ্ধার্থ অভিজিৎ ॥ কৈজাশ কোয়েঝা ॥ কাওকাবা হীরা ২৪-২৬
বিশেষ রচনা	ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত মারণাস্ত্র ও আধুনিক অস্ত্র ॥ স্বকৃত নোমান ৩১
ছোটগল্প	রুবি না ॥ অরুণ কুমার বিশ্বাস ৩৪
ধারাবাহিক উপন্যাস	বহ্নিলতা ॥ অমর মিত্র ৩৭
কেন্দ্রবিন্দু	পশ্চিমবঙ্গ ॥ রাতুল হরিৎ ৪১
লোকসংস্কৃতি	ভারতের ডুয়ার্সের আট জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পূজা-পার্বণ অম্বরীশ ঘোষ ৪৫
শেষ পাতা	সুখ-দুঃখের লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ফরিদুজ্জামান ৪৮

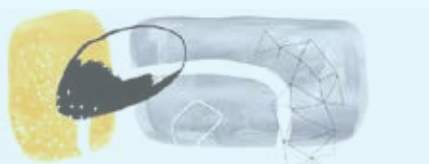

প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৪

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ঢাকায় ভারতের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

মাননীয় হাই কমিশনার তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ অংশীদারত্বের প্রশংসা করেন এবং একটি স্থিতিশীল, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভারতের অঙ্গীকার নিশ্চিত করেন। বাংলাদেশের মাননীয় স্পিকার এই উপলক্ষ্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি অন্যান্য জাতির জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে।

এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সরকার, সংসদ, বিচার বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কূটনৈতিক কোরের সদস্যগণের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অতিথিসহ এক হাজারেরও বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। স্বনামধন্য বাংলা ব্যান্ড 'জলের গান'-এর একটি বর্ণাঢ্য পরিবেশনা দুই দেশের যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে।

সম্পাদকীয়

স্বাগত ২০২৪। ভারত বিচিত্রার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রীতি-শুভেচ্ছা।

দেশভাগপূর্ব ভারতীয় রাজনীতির দুই মহানায়ক–মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মহাত্মা গান্ধী আমৃত্যু এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র অন্তত বিশ বছর স্বাধীনতার সংগ্রামের মহাযজ্ঞে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদানকারী রাজনৈতিক দল 'জাতীয় কংগ্রেস'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আলাদা সময়ে দুজনই দলটির সভাপতির দায়িত্বপালন করেছেন। তবে মহাত্মা গান্ধী আমৃত্যু ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং ভারতবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আস্থাশীল প্রভাবশালী নেতা। অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় আকাঙ্ক্ষী এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সেটা অর্জনে প্রতিশ্রুতিশীল। কথিত রয়েছে, গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলমানকালে ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই ইংল্যান্ড থেকে ফিরে বোম্বেতে যান সুভাষ। সেই সময় গান্ধীজিও বোম্বেতে অবস্থান করছিলেন। ওইদিন বিকালে তাঁদের দেখা হয়। নেতাজি তখন গান্ধীজিকে নানান প্রশ্ন করেন এবং গান্ধীজিও উত্তর দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম প্রশ্নে গান্ধীর উত্তরে সুভাষ খুশি হলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে খুশি হতে পারেননি। সেই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি ছিলেন অহিংস আন্দোলনের পক্ষে। অপর দিকে, সুভাষচন্দ্রের কাছে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কেবল অহিংস নয়, যেকোনো উপায়ই ছিল গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, আন্দোলনের পথে গান্ধীজি ও তরুণ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা যায় প্রথম বৈঠকেই। কেননা ব্রিটিশ পরাধীনতার প্রগাঢ় অন্ধকারে যখন গান্ধীজি জাতিকে শাসকের বিরুদ্ধে 'না' বলার শিক্ষা দিতে চাচ্ছিলেন, তখন নেতাজি সুভাষের তরুণ রক্ত জাতির কাছ থেকে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে 'না' শোনার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে সুভাষ কলকাতায় ফিরে এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর মধ্যে তিনি একজন সত্যিকার আদর্শ নেতা খুঁজে পান। অবশ্য দেশবন্ধুর মৃত্যু (১৬ জুন, ১৯২৫) পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ক্রমশ নিজের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে ফেলেন এবং ১৯৩৯ সালের দিকে প্রতিষ্ঠা করেন বামপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক। তৎপরবর্তীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ বা আইএনএও গড়ে তোলেন সুভাষচন্দ্র এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রকৃত অর্থেই মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তার পন্থা ভিন্ন হলেও দুজনের মধ্যেই ছিল দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। দুজনেই ছিলেন ভারতমাতার রক্ষাকবচ।

ব্রিটিশ শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি-আন্দোলন ও ভারতবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান অতুলনীয়। ফলে তাঁরা এখন জাতির দৃষ্টিতে কিংবদন্তির মর্যাদায় আসীন। দুজনই ভারতীয়দের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থায়ীভাবে আসনাসীন। দুজনই ভারতবাসীর কাছে উপহারস্বরূপ।

নিয়মিত বিভাগসমূহ থেকে পাঠকগণ বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন।

সকলের কল্যাণ হোক।

কালে-কালান্তরে
ভারতের সাধারণতন্ত্র

গৌতম রায়

প্রচ্ছদরচনা

অবিভক্ত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে ব্রিটিশ তখন মনস্থির করে ফেলেছে। তৈরি হয়েছে সংবিধান পরিষদ। যেখানে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে সংলাপ চলছে। বাংলা যে তখনো বিভক্ত হবে–এই বিষয়টি মানসিকভাবে ব্রিটিশরা চূড়ান্ত করে ফেললেও, ভারতের সংবিধান পরিষদে, তারা, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের মানুষদেরও প্রতিনিধি হিসেবে রেখেছেন।

কুষ্টিয়া জেলা থেকে এই সংবিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছেন মুসলিম লীগের প্রতিনিধি গিয়াসউদ্দিন পাঠান। তিনি মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হলেও যথেষ্ট প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। জেলাশাসক অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন পাঠানের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। সংবিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তাঁর বন্ধু অন্নদাশঙ্করকে বললেন; নির্বাচিত তো হলাম সংবিধানসভায়

এখন তো বেশ কিছুদিন দিল্লিতে গিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমার মুশকিল হলো, আমি তো নিরামিষ খাই।

দিল্লিতে গিয়াসুদ্দিনের সতীর্থ যাঁরা বাংলা থেকে সংবিধানসভার প্রতিনিধি হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই আমিষ ভোজী। তাই গিয়াসউদ্দিন পাঠানের চিন্তা, তিনি নিরামিষাসী, ফলে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার কী হবে?

ভারতীয় সংস্কৃতির এই যে বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্যের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করেছিল ভারতের সংবিধানসভা। সেই প্রতিনিধিত্বের এক অনিন্দ্য সুন্দর প্রতিবিম্ব হলো ভারতীয় সংবিধান। চিরন্তন ভারতের যে সার্বিক আদর্শ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সেটিকে প্রস্ফুটিত করে তোলাই ছিল সংবিধানসভার প্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের কালে বহু মতভেদ এসেছে। বিতর্ক হয়েছে। দ্বন্দ্ব যে উপস্থিত হয়নি, তা নয়। কিন্তু সর্বোপরি চিরন্তন ভারতের যে অন্তর আত্মা, তাকে ফুটিয়ে তোলবার লক্ষ্যে, ভারতের সংবিধান, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যে সার্বিক অধিকার, দায়িত্ব, কর্মক্ষমতা–এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার জেরেই ভারত আজ নানা ধরনের টানাপড়েন সত্ত্বেও, গোটা বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতের নাগরিকরা এখানে কোনো রাজা বা রানি বা সম্রাটের অধীনস্থ নন। ভারত রাষ্ট্রের তাঁরা নাগরিক। আর এই ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাঁদের অধিকার হলো, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়; 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলবে কি শর্তে, আমরা সবাই রাজা।'

ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, ভারতীয় সংবিধান যে প্রজাতান্ত্রিক পরিকাঠামো রচনা করেছে, তার ফসল হিসেবেই অবিভক্ত ভারতের বিভাজিত অংশগুলো, বিভিন্ন সময়ে, গণতন্ত্র রক্ষার প্রশ্নে নানা সংকটের আবর্তের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হলেও, ভারত কিন্তু কখনো প্রজাতন্ত্র রক্ষার প্রশ্নে সংকটের কোনো চরম পর্যায়ে উপনীত হয়নি। আজ পর্যন্ত ভারতীয় গণতন্ত্রকে অবদমিত করে, কখনো কোনো রাজনীতির লোক বা সেনাজগতের মানুষ, নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি।

ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তান বা বাংলাদেশে একাধিকবার কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে। এই দিক থেকে বিচার করে বলতে হয়, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বহু টানাপড়েনের ভেতর দিয়ে যে মজবুত ভিতের ওপর এসে আজ দাঁড়িয়েছে। সেই ভিতকে ধ্বংস করা, ভারতের ভেতরের কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বা ভারতের বাইরের কোনো বহিঃশক্তির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সাতের দশকে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময়কালে একটা ভয়াবহ সংকটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই সংকট যত গভীরই হোক না কেন, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যে মজবুত বনিয়াদ, তার সুফল হিসেবে, ভারতীয় নাগরিকেরা, গণ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, সেই গণতন্ত্রের সংকটকে, একটা সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে, সুস্থিত অবস্থায় এনে দাঁড় করাতে সম্ভবপর হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের এই যে মূল্যবোধ, সেই মূল্যবোধের ভিত্তি গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে, প্রজাতন্ত্রের যে অনবদ্য ভূমিকা ভারতীয় জনমানসের পড়েছে, তার ভিত্তিতেই আজও ভারত, নানা উত্থান পতনের ভেতর দিয়েই, মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নে, গোটা বিশ্বে, নিজের স্থানকে, বিশেষভাবে উজ্জ্বল করেছে।

ভারতীয় মূল্যবোধের প্রথম, প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে; ভারতীয় জনমানসে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে, 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'–এই সত্যটির যুগ যুগ ধরে উচ্চারিত হয়েছে, সেই সত্যকে আত্মস্থ করে, কেবল বর্তমান সময় নয়, ভাবি কালের জন্য ও, সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করা।

দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো দেশ এভাবে ভাষা, ধর্ম, বর্ণের বিশিষ্টতাকে মান্যতা দিয়ে, পরস্পর, পরস্পরের সঙ্গে, 'সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো', সেই ভালোর উপাসনায় রত রয়েছে এমনটা একনাগারে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে একটা সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে দেশভাগের যে বিষমন্ত্র 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'কে কবরে পাঠানো হয়েছিল, সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে, বাঙালির বিজয়বৈজয়ন্তি উড়িয়ে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি করেছিল।

এমন পরিস্থিতি কিন্তু ভারতে আজ পর্যন্ত উদ্ভব হয়নি, তার একমাত্র কারণ; ভারতীয় সংবিধান, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে যে মজবুত বনিয়াদের ওপর স্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে, তারই ফলে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংকট ভারতের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এসেছে। '৪৭ পরবর্তী সময়ে, সেসব সঙ্কটের মোকাবিলার জন্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, নাগরিক সমাজ করেছে। কিন্তু শেষ কথা বলেছে প্রজাতন্ত্র

আবার স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে শাহাদাত বরণের পর, মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত মূল্যবোধ পদদলিত হয়েছিল। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অবদমন করে রেখেছিল সেনাশাসন। মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের জন্য। মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে ধর্ম ব্যতিরেকে, ভাষার ঐক্যের ভিত্তিতে, হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান, শিখ, জৈন–সব বাংলাভাষী মানুষকে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', যা ছিল, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীজমন্ত্র, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। বাঙালিকে অনেক রক্ত, স্বেদ ঝরাতে হয়েছিল।

এমন পরিস্থিতি কিন্তু ভারতে আজ পর্যন্ত উদ্ভব হয়নি, তার একমাত্র কারণ; ভারতীয় সংবিধান, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে যে মজবুত বনিয়াদের ওপর স্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে, তারই ফলে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংকট ভারতের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এসেছে। '৪৭ পরবর্তী সময়ে, সেসব সঙ্কটের মোকাবিলার জন্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, নাগরিক সমাজ করেছে। কিন্তু শেষ কথা বলেছে প্রজাতন্ত্র। শেষ কথা বলেছে দেশের মানুষ সেনানায়কেরা নয়।

ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য রাজনীতির মানুষরা যেমন তাঁদের মতন করে লড়াই করেছেন, সর্বোপরি সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, ফলপ্রসূ করবার ক্ষেত্রে, ভারতীয় নাগরিকেরা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, তাদের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তাকে বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

ভারতে এত নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ আছেন, ভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষ আছেন, ধর্ম বৈচিত্র্যের মানুষ আছেন, একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেও আবার বহু ধরনের ধারা-উপধারা আছে, লোকায়াত ধর্ম আছে, গৌণ ধর্ম আছে–এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ-সংঘাত যে কখনো হয় না, সেটা জোর গলাতে বলতে পারা যায় না। কিন্তু জোর গলাতে যেটা বলতে পারা যায়, মানুষই সেই দ্বন্দ্ব বিরোধের অবসান ঘটিয়ে, আবার সেই মনুষ্যত্বের জয়গান গাইতে সক্ষম হয়।

এমনটা ঘটবার পিছনে সব থেকে বড় অবদান হলো, ভারতের মহান সংবিধান যে প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছে সেইটিই।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রূপরেখা কি হবে? সংবিধান কীভাবে স্বাধীন সার্বভৌম ভারতকে পরিচালনার দিশা যোগাবে? তা নিয়ে সংবিধান পরিষদে বহুমাত্রিক বিতর্ক হয়েছে। সেই বিতর্কগুলোর ভেতর দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর যে ধ্যান ধারণা ভারতীয় সংবিধানে রচিত হয়েছে, সেটি কিন্তু ভারতের সংবিধানে একটি বিশেষ রকমের বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় সংবিধানের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই এই মনোভাব পোষণ করে থাকেন যে, ইংল্যান্ডের বেশ দেশ পরিচালনাসংক্রান্ত ধ্যান ধারণা, ভারতীয় সংবিধানে অনেকখানি ছায়াপাত করেছে। সংবিধানপ্রণেতাদের একটা বড় অংশের ইউরোপের দেশ পরিচালনার রীতি ব্যবস্থা এবং তার

এই রকম স্বীকৃতির অভাব সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল কিনা–সেটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘিরে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে একটি বিতর্কিত বিষয়। অনেকেই মনে করেন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে, বিভিন্ন প্রদেশগুলোর যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, এমনকি ধর্মাচারণজনিত বৈশিষ্ট্য (অনেকেরই ধারণা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ ছিল। এই ধরনের ধারণার পেছনে খুব একটা বাস্তবতা নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করে, যে ভ্রমণকাহিনি লিখেছিলেন, সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সোভিয়েতের অভ্যন্তরে চার্চগুলোর অবস্থানের কথা

পরিচালন পদ্ধতির সঙ্গে সম্যক পরিচিতি ছিল এ কথা সত্যি। তা বলে এটা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, পাশ্চাত্যের সাংবিধানিক ধ্যানধারণার কপি পেস্ট করে তাঁরা ভারতের সংবিধান রচনা করেছিলেন। এই প্রচার যারা করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে একটা তরল ধারণা থেকেই এই ধরনের কথা তারা বলতে অভ্যস্ত।

আমরা যদি একটু গভীরভাবে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি আর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ ঘিরে তুলনামূলক আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে যেভাবে ভারতীয় সংবিধানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার নজির কিন্তু আমরা ইউরোপের দেশগুলোতে খুব একটা পাওয়া যাবে না। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর ভেতর দিয়ে ভারতের ভাষা, ধর্ম, বর্ণসহ নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য–এই সমস্ত বিষয়গুলোর যে বৈচিত্র্য, তাকে একাধারে সম্মান জানানো হয়েছে। মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে প্রত্যেকটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখবার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তাঁদের ভারতীয় ডোমিনিয়ানে সসম্মানে অবস্থানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই রকম স্বীকৃতির অভাব সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল কিনা–সেটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘিরে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে একটি বিতর্কিত বিষয়। অনেকেই মনে করেন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে, বিভিন্ন প্রদেশগুলোর যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, এমনকি ধর্মাচারণজনিত বৈশিষ্ট্য (অনেকেরই ধারণা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ ছিল। এই ধরনের ধারণার পেছনে খুব একটা বাস্তবতা নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করে, যে ভ্রমণকাহিনি লিখেছিলেন, সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সোভিয়েতের অভ্যন্তরে চার্চগুলোর অবস্থানের কথা। সেখানে বিশ্বাসী মানুষদের প্রার্থনায় অংশ নেওয়ার কথা। বস্তুত 'ধর্মাচরণ' এই বিষয়টিকে মানুষের ব্যক্তি অধিকারের পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল সোভিয়েতে। কোনো অবস্থাতেই ধর্মাচরণের সঙ্গে রাষ্ট্র নিজেকে সম্পৃক্ত করত না) সেই সমস্তগুলিকে একটা 'ছাঁচে ঢালা' অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা, তার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। নানা ধরনের অসন্তোষ ছিল। এই 'ছাঁচে ঢালা' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর, 'রাশিয়ার চিঠি'তে সোভিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থা ঘিরে মন্তব্য করেছিলেন।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র আজও স্বমহিমায় নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রাখতে সক্ষম হচ্ছে এই কারণেই যে, একটা কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচের মধ্যে ভারতবাসীকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা ভারতীয় সংবিধান কখনো করেনি। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে তার অঞ্চল বিশেষে, সমস্ত ধরনের অধিকার বজায় রাখবার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে, এই আঞ্চলিকতা যাতে কোনোভাবে বিচ্ছিন্নতায় পরিণত না হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে যথেষ্টই গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়েছে। তাই কখনো পাঞ্জাবে, কখনো আসামে কখনো ভাষার নামে বিন্ধ্য পর্বতের অপরপ্রান্তে, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে বা ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তাগিদে ও বিচ্ছিন্নতার ধারা উপধারাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও, কোনোরকম লাঠি, গুলি, বন্দুককেই একমাত্র আশ্রয় না করে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার ওপরে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রনায়কেরা আস্থা স্থাপন করায়, প্রজাতন্ত্রের মর্যাদায় বিশেষভাবে গৌরবান্বিত হয়েছে।

একটি দেশের প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনই সার্বিকভাবে রক্ষিত হয়, যখন দেশে প্রচলিত সাংস্কৃতিক, সামাজিক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর যে বিচিত্রতা, সেগুলো অক্ষত রেখে, দেশের কল্যাণে, নাগরিক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায়। ব্রিটিশ ১৮৫৭ সালে যে সেনাবিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিল, ব্রিটিশের সীমাহীন শোষণ অত্যাচার। কিন্তু মানুষ সেই অত্যাচার সম্পর্কে সরব হওয়ার সাহস তখনো পর্যন্ত সাহস অর্জন করতে পারেনি। সাধারণ মানুষ না পারলেও, সেনাবাহিনীতে যাঁরা ছিলেন দেশের মানুষ, তাঁরা তো, জীবনমৃত্যুকে, পায়ের ভৃত্যে পরিণত করেই শাসকের হয়ে লড়াইতে ব্রতী ছিলেন।

আজ যেমন যেকোনো স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীতে যাঁরা অবস্থান করেন, তাঁরা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আত্মনিবেদিত থাকেন। বিদেশি শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য আত্মনিবেদিত থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যেসব ভারতীয়রা ছিলেন, তাঁদের কাছে তো দেশের স্বরূপের থেকে, তাঁদের নিয়োগকর্তা ব্রিটিশের স্বার্থকেই বেশি মর্যাদা দিতে হতো পেটের তাগিদে। আর এখানেই ১৮৫৭ তে যে সংঘাত শুরু হয়েছিল, যখন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যে ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে, বাধ্যতামূলকভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি অবদমিত করে, নিজের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে বজায় রাখতে, এনফিল্ড রাইফেলের টোটা সেনাবাহিনীকে দাঁত দিয়ে কাটবার আদেশ দিয়েছিল সেই ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে।

ভারতের যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সেখানে একই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে অবস্থান করা সুদূর উত্তরের একজন মানুষের ধর্মাচরণ, খাদ্যাভ্যাস সামাজিক রীতিনীতি–তার সঙ্গে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাস করা একজন মানুষ, যিনি সেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেই অবস্থান করেন বা শুধু দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করা একই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে অবস্থানরত একজন মানুষের ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট, ফারাক রয়েছে, অথচ এই ফারাকগুলোকে বজায় রেখেই প্রত্যেকের নিজের নিজের সামাজিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য–এইসব প্রত্যেকটি বিষয়কে সমানভাবে বজায় রাখবার যে ধারা, যা যুগ যুগ ধরে ভারতকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনায় স্রোতস্বিনী রেখেছে, সেই ধারা ব্রিটিশ উত্তর যুগে, স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে সমানভাবে বজায় থাকতে পারছে ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

এই বৈশিষ্ট্যই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে গোটা বিশ্বে এক অনন্যতার মধ্যে উপস্থাপিত করেছে। বিশ্বের খুব কম দেশ আছে, যারা তাদের দেশের ভিতর নাগরিক সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-ভাষাগত বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে বজায় রেখেও, রাষ্ট্রীয় দ্যোতনার ভিতরে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পেরেছে। দেশবাসীকে আনন্দিত রাখতে পেরেছে। খুশি রাখতে পেরেছে।

এই দিক থেকেই ভারত গোটা বিশ্বে প্রজাতন্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা আর প্রয়োগের ভেতর দিয়ে অনন্যতা সৃষ্টি করেছে। এই অনন্যতা কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতির মহলেই একটা যুগান্তকারী বিষয় নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কার্যাবলি একটা বিশেষ রকমের উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

ভাষার বৈচিত্র্য নিয়ে, ধর্মের বৈচিত্র্য নিয়ে, এমনকি ধর্ম পালনের রীতিনীতি নিয়ে ভারতের জনগণের মধ্যে সংঘাত যে কখনো হয়নি তা নয়। কিন্তু সেই সংঘাতকে প্রশমিত করতে রাষ্ট্রশক্তিকে জোরদার ভাবে ব্যবহার, এটি পাঞ্জাব আর কিছু অংশে আসাম ছাড়া অন্য কোথাও সেভাবে দরকার পড়েনি।

ভারতের প্রজাতন্ত্রের শক্ত বনিয়াদের জন্যই সমস্ত রকমের ভাষা-সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ক পারস্পরিক বিরোধগুলোর, রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়েই, একটা মীমাংসার সূত্রে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়েছে। আর এই রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোকে ত্বরান্বিত করতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন ধরনের মানুষদের যে সামাজিক প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাও একটা বিশেষ রকমের ভূমিকা পালন করতে পেরেছে প্রজাতন্ত্রের শক্ত বুনিয়াদের দরুন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক রাজনীতিক টানাপড়েনে দেশের সার্বভৌমত্ব ঘিরে নানা ধরনের সংকটের আবর্তে রচিত হয়েছিল। পাকিস্তানের ভারতবিদ্বেষ, চীন- ভারত সীমান্ত সমস্যা, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের আবার ভারত আক্রমণ–এই সাফল্যে ভারতের বীর সেনানিরা, তাঁদের অসামান্য কর্মকাণ্ডের শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হতে পেরেছিলেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট বুনিয়াদের ফলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় ভারতের যে সমরাস্ত্রের সাফল্য, রণনীতির সাফল্য, সেই সঙ্গে কূটনৈতিক সাফল্য ভারত অর্জন করতে পেরেছিল–আন্তর্জাতিক মহলে সেই সময়কালে। ভারতের শাসক এবং বিরোধীরা সমস্ত রকমের রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে, দেশ রক্ষার্থে যেভাবে একটা জাতীয় ঐক্যমত্যে অবস্থান গ্রহণ করেছে, এটাও কিন্তু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সাফল্যেরই একটা অঙ্গ।

অতি সাম্প্রতিককালের কারগিল সমস্যার সময়ে আমরা দেখেছি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর যে ভূমিকা, সে ভূমিকা ঘিরে তাঁর বিরোধী দলের রাজনীতির লোকেরা, ভারতের অভ্যন্তরে সমালোচনা করলেও, আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অবস্থানকে জোরালোভাবে তাঁরা সমর্থন জানিয়েছিলেন। পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছেন। ভারতের বীর সেনাবাহিনীর সমস্ত রকম যোদ্ধাদের প্রতি সহযোগিতা, শুভেচ্ছার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই যে ঘটনাগুলো ঘটা সম্ভবপর হয়েছে তার পিছনেও রয়েছে কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর একটা সুনির্দিষ্ট ভিত্তি। যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র আজ তার বাল্য কৈশোরকাল কাটিয়ে পরিপূর্ণ যৌবনকালে নিজেকে এনে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের যে ধ্যানধারণা আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সংবিধান রচনার কালে আখ্যায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটিকে ভারতীয় জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে, সর্বস্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তার জেরেই স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও প্রজাতন্ত্র হিসেবে ভারত স্বমহিমায় বিদ্যমান রয়েছে। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার সত্তর বছরের পরে, আজ পর্যন্ত এই দেশে কখনো সেনা অভ্যুত্থান তো ঘটেইনি, এমনকি সেনা অভ্যুত্থানের মতো কোনো পরিবেশ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি।

ভারতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আজ যে পরিশীলিত ভাবনার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তার পরীক্ষা ভারত, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দেয় এবং অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে সেই পরীক্ষায় ভারত উত্তীর্ণ হয়।

যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশের মতোই ভারতে বহুদলীয় গণতন্ত্র এখানকার প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদকে আজকে আরো শক্তিশালী করেছে। ভারতের চলতি বছরে (২০২৪) যে লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে, গোটা বিশ্বের প্রত্যাশা, প্রজাতন্ত্রের এই শক্ত বনিয়াদের ওপর ভারত তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আগামী দিনে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে, এই নির্বাচনকে, একটা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবে প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করবার লক্ষ্যে। •

গৌতম রায়
প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ জানুয়ারি

কেশবচন্দ্র সেন

০১ জানুয়ারি ১৮৯০ ❖ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯১৪ ❖ অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯০৩ ❖ জসীম উদ্‌দীনের জন্ম
০২ জানুয়ারি ১৯১৭ ❖ শওকত ওসমানের জন্ম
০৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
০৮ জানুয়ারি ১৯০৯ ❖ আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম
১০ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ ❖ মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি
১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ ❖ মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯০১ ❖ সুকুমার সেনের জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯০৫ ❖ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯৩৫ ❖ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ ❖ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম
২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ প্রজাতন্ত্র দিবস
২৯ জানুয়ারি ১৯৭৬ ❖ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মৃত্যু
৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ ❖ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম
৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ ❖ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ॥ শহিদ দিবস

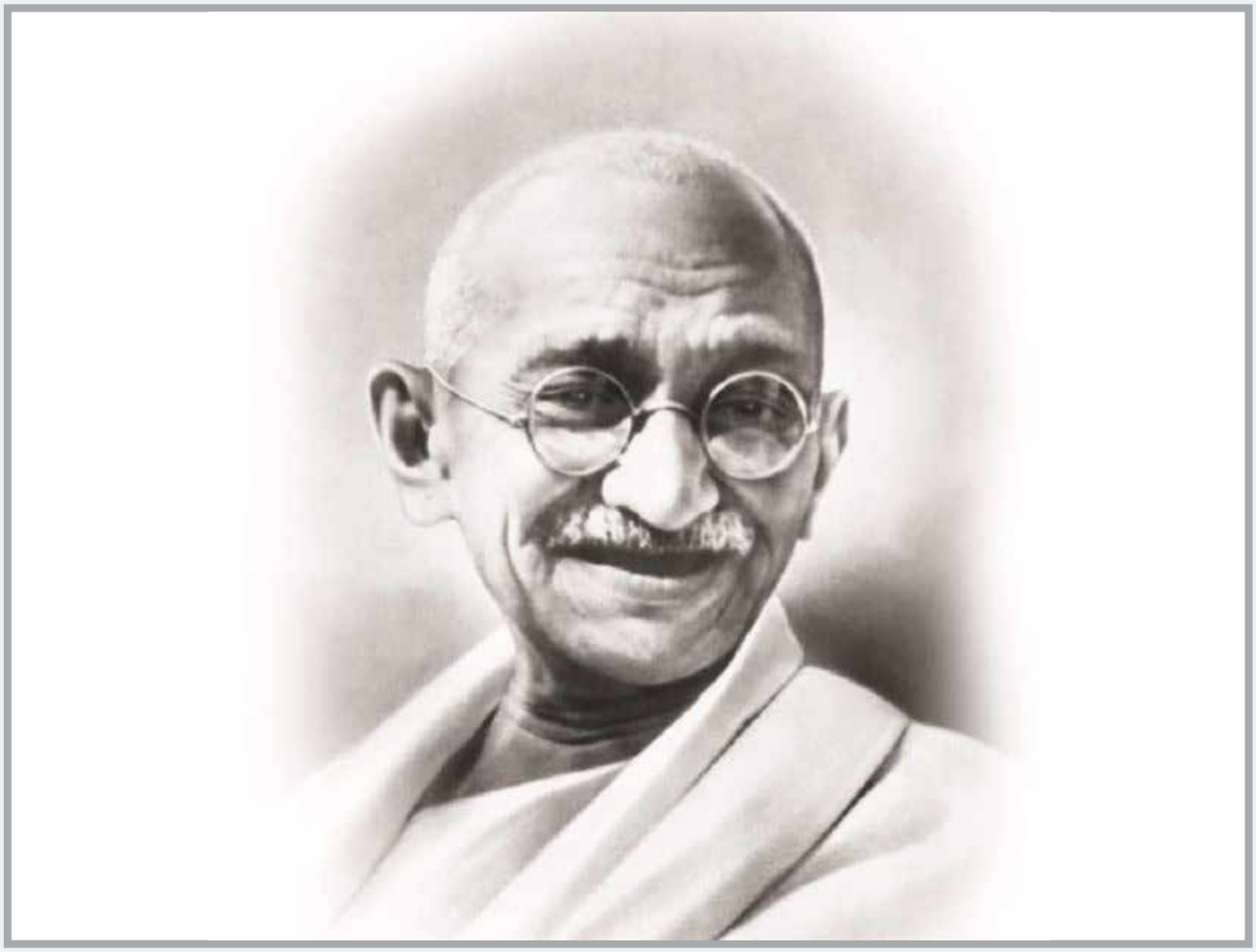

জন্ম : ২ অক্টোবর ১৮৫৯ • মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সমকালীন প্রেক্ষাপট ও মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শন

ড. শিপ্রা সরকার

ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাসে যে-সব মানুষ কর্ম ও সাধনায়, জ্ঞান ও দর্শনচর্চায়, সৃষ্টিশীলতা ও সমাজগঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) তাঁদের অন্যতম। কেবল রাজনৈতিক পরিচয়েই নয়–আইনজীবী, সমাজসংস্কারক, পত্রিকা-সম্পাদক, ধর্মসভা-পরিচালক, শিক্ষা-সংস্কারক। সর্বোপরি মহান স্বাধীনতার সংগ্রামী হিসেবে মহাত্মা গান্ধী সমধিক পরিচিত। গান্ধী সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আলবার্ট আইনস্টাইন একদা বলেছিলেন যে, যুগ যুগ ধরে ভবিষ্যতের প্রজন্ম পরম বিস্ময়ে ভাববে এমন একজন রক্তমাংসের মানুষ একদিন এই পৃথিবীর মাটিতে পদচারণা করেছিলেন; জীবনসাধনার দীর্ঘ যাত্রাপথে, মানবপ্রেম ও সমাজকল্যাণের দূত হিসেবে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন

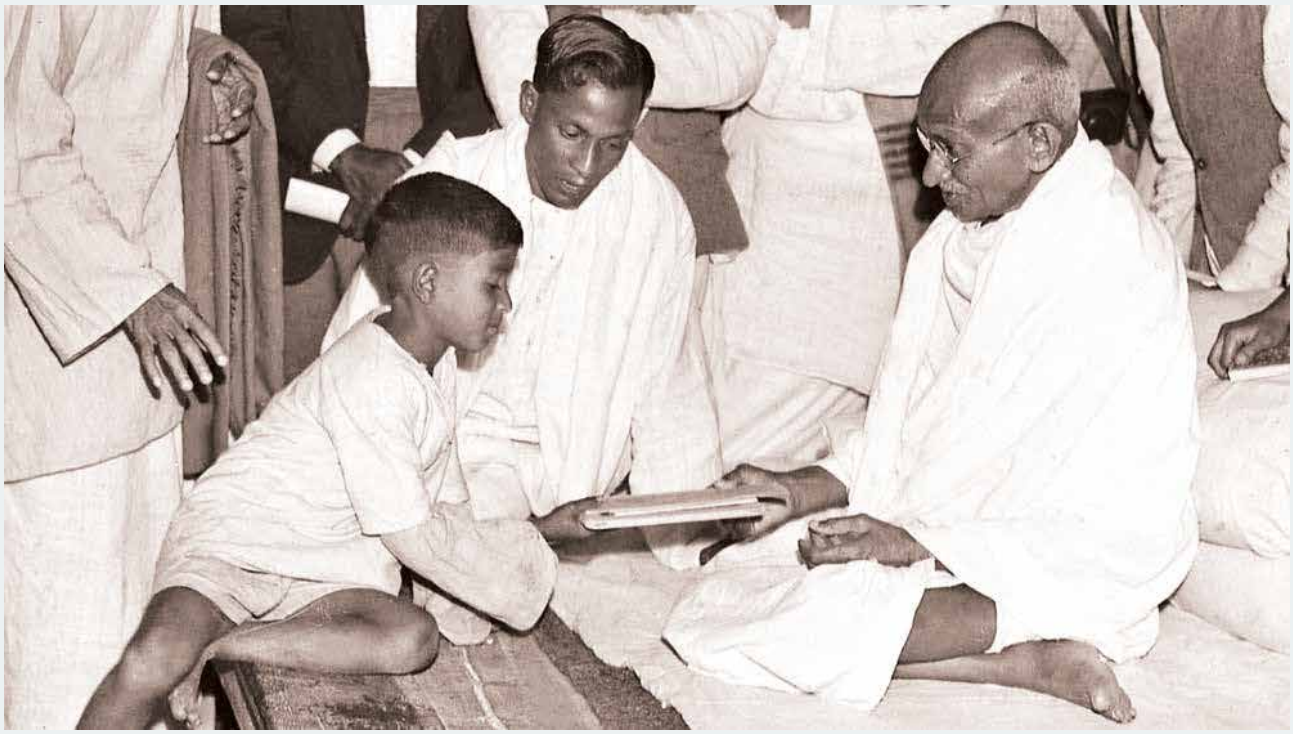

গান্ধীর শিক্ষাদর্শনের মৌল বৈশিষ্ট্য

মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের চিন্তা করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল কথাই ছিল মানব কল্যাণ ও সমাজ-উন্নয়ন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে গান্ধীর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীর রচনার পরিমাণ বিপুল। সেই বিপুল রচনা থেকে গান্ধীয় শিক্ষাদর্শনের প্রধান প্রবণতাগুলো আমরা এভাবে তুলে ধরতে পারি–

১. আট বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়বে। এটিই হবে শিক্ষার প্রথম স্তর। শিশুদের শিক্ষা হবে প্রধানত শরীরশ্রমমূলক। ছেলেমেয়েরা কোন কাজ করবে তা স্থির করার জন্য প্রত্যেকের বিশেষ প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

২. জোর করে শিশুকে কোনো কিছু শেখানো হবে না। শিশুকে যা কিছু শেখোনো হচ্ছে তার সম্বন্ধে তার মনে যেন আগ্রহ জন্মে। শিক্ষা শিশুর কাছে খেলার মতো মনে হবে। আর খেলাও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

৩. মাতৃভাষার মধ্যমে সব শিক্ষা দিতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য।

৪. শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর ৯ বছর থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করবে। দ্বিতীয় পর্যায়েও পরিশ্রম চলবে। এই স্তরেই সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হবে।

৫. দ্বিতীয় পর্যায়ে ছেলেদের তাদের বংশগত পেশা এমনভাবে শেখাতে হবে যে স্বেচ্ছায় তাঁরা যেন সেই পেশা গ্রহণ করে নিজ জীবিকা উপার্জন করতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

৬. দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা হবে সাবলম্বী। শিক্ষাপ্রাপ্তির পর শিক্ষার্থী যে কোনো কাজে যোগদান করতে পারে। সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে।

৭. ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত হবে শিক্ষার তৃতীয় স্তর, তৃতীয় স্তরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা ও পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৮. শিক্ষকরা সেবার মানসিকতা নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসবেন।

৯. ইংরেজি শেখানো হবে অনেকগুলো ভাষার মধ্যে একটি হিসেবে। ইংরেজি ব্যবহৃত হবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য।

১০. নারী-শিক্ষার ব্যাপারে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত নেই গান্ধীর। তাঁর মতে, 'নারী-শিক্ষা' সম্বন্ধে আমি জোর করে বলতে পারি না যে পুরুষদের শিক্ষা থেকে তা পৃথক হবে কিনা এবং হলে কখন তার সূত্রপাত হবে। তবে আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, নারীদের পুরুষের সমান সুবিধা পাওয়া উচিত।

১১. অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য থাকবে নৈশ-বিদ্যালয়। 'তবে আমার মনে হয় না যে প্রাপ্তবয়স্কদের লিখতে, পড়তে ও গণিত শেখানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা তাঁদের সাধারণ জ্ঞানপ্রাপ্তিতে সাহায্য করা হবে এবং তাঁরা যদি চান তাহলে আমরা তাদের লিখতে, পড়তে ও অঙ্ক কষতে শেখাব।'[২]

গান্ধীর শিক্ষাতত্ত্ব : অন্তর্নিহিত দর্শন

শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণেরে যে পথ মাহাত্মা গান্ধী আবিষ্কার করেন, তার নাম দিয়েছেন 'নই-তালিম'। শিক্ষাজগতে এ-এক বিরাট পদক্ষেপ। শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থী কর্মক্ষম হয়ে গড়ে উঠবে। ফলে শিক্ষার প্রতি তারা আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাঁর মতে, গ্রামে স্কুল-পাঠশালা ইত্যাদি জনজীবনে শিক্ষার কোনো স্থায়ী ছাপ রাখতে পারে না, পড়ুয়ারা একদিকে যা শেখে, অন্যদিকে তা ভুলে যায়। কেন এমন হয়? যেহেতু শিক্ষার কোনো অর্থনৈতিক ভিত নেই, শিক্ষার কোনো সামাজিক তাৎপর্য নেই–শিক্ষার অধিকাংশ ভাগটাই একটা সাজানো অলঙ্কার মাত্র। তাই তিনি কোনো-না-কোনো প্রকার কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। গান্ধীজি মনে করেন, হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলে তা বিস্তার লাভ করে ও স্থায়ীভাবে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়।[৩] গান্ধীজি লিখেছেন–

I hold that true education of the intellect can only come through a proper exercise and training of the bodily organs, e.g., hands, feet, eyes, ears, nose, etc. In other words, an intelligent use of the bodily organs in a child

বিশেষত শিক্ষার সঙ্গে শ্রমকে যুক্ত করে কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের যে তত্ত্ব তিনি দিয়েছেন, তা একেবারে নতুন ও অভিনব। এছাড়া শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের যে কথা তিনি বলেছেন তাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শিক্ষা ও সমাজউন্নয়নকে তিনি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তাঁর এ-অভিমতও যুগান্তকারী। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ করে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়

provides the best and quickest ways of developing his intellect.[৪]

মহাত্মা গান্ধী শিক্ষাকে সমাজকল্যাণের শক্তিউৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষের চিত্তশুদ্ধির কথা বলেছেন। শিক্ষা, গান্ধীর কাছে সমাজসংস্কারের অন্যতম শক্তি। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাচিন্তার মূল দর্শন তাঁর ভাষায়–

'Our education has got to be revolutionised. The brain must be educated through the hand. If I were a poet, I could write poetry possibilities of the five fingers. Why should you on the think that mind is everything and hands and fact nothing... An education which does not teach us to discriminate between good and bad, to assimilate the one and aschew the other is a misnomer.'[৫]

গান্ধী শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও চরিত্রশক্তির উন্নয়নের কথা বলেছেন। এজন্য পূর্ববর্তী শিক্ষাভাবনা থেকে গান্ধীর শিক্ষাভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচেতনা সৃষ্টির কথা বলেছেন।
তাঁর ভাষায়–
'Democracy disciplined and enlightened is the Finest thing in the world. A democracy Prejudiced, Ignorant and superstitions, will land itself in choos and may be self-destroyed. So, we must train the masses of men who have a heart of gold, who feel for the country, who want to be taught and led.'[৬]

সমকালীন প্রেক্ষাপটে গান্ধীর শিক্ষাদর্শন : একটি মূল্যায়ন

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যেসব চিন্তাবিদ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, মাহাত্মা গান্ধী তাঁদের অন্যতম। তাঁর শিক্ষাচর্চার অনেক কিছুই ছিল যুগান্তকারী। বিশেষত শিক্ষার সঙ্গে শ্রমকে যুক্ত করে কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের যে তত্ত্ব তিনি দিয়েছেন, তা একেবারে নতুন ও অভিনব। এছাড়া শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের যে কথা তিনি বলেছেন তাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শিক্ষা ও সমাজউন্নয়নকে তিনি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তাঁর এ-অভিমতও যুগান্তকারী। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ করে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তবে একই সঙ্গে তিনি মাতৃভাষাচর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। শিক্ষা ও গণতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যে অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন, তাও তাঁর শিক্ষাদর্শনের অভিনবত্বের একটি উল্লেখযোগ্য প্রান্ত।[৭]

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শনের ইতিবাচক অনেক বৈশিষ্ট্য থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর শিক্ষাচিন্তা বিষয়ে কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যায়। শিক্ষার সঙ্গে জাতিবর্ণ প্রথাকে তিনি একাত্ম করে দেখেছেন। মানুষের বংশগত পেশাকে তিনি আধুনিক কালেও শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর এ-চিন্তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এছাড়া, নারীশিক্ষার ব্যাপারেও তাঁর অভিমত পরিচ্ছন্ন নয়।[৮]

নারীশিক্ষার তিনি বিরোধিতা করেননি–তবে সুদৃঢ়ভাবে তাঁর পক্ষে কিছু বলেননি। বরং তিনি নারীকে কেবল গৃহস্থালি শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার ব্যাপারেও তাঁর নেতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি।[৯]

মহাত্মা গান্ধী ঔপনিবেশিক আমলে পরাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাবিষয়ক তাঁর তত্ত্ব ও মতবাদ প্রকাশ করেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকেই পরিচালিত হয়েছে তাঁর সকল কর্ম। সে-প্রেক্ষাপটে তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল ভিত্তিই ছিল–শিক্ষালাভ করে মানুষ সাবলম্বী হয়ে উঠবে। কারণ, সাবলম্বী হলেই মানুষ সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। গান্ধীর শিক্ষাদর্শন আলোচনার সময় এ-দিকটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে একথা স্বীকার করতে হবে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাচিন্তা যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গান্ধীজির শিক্ষাচিন্তার মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষায় যে বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল, আজ তা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হচ্ছে। তাঁর 'নই-তালিম' শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অনেকেই মার্কসীয় শিক্ষাব্যবস্থার ছায়া লক্ষ করেছেন।[১০] ভারতবর্ষে শিক্ষাজগতে আমূল পরিবর্তন করতে মাহাত্মা গান্ধী যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁকে সর্বকালের একজন মহান শিক্ষাচিন্তাবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। •

তথ্যসংকেত

১. Homer A. Jack (ed.), The Gandhi Reader' (New York, 1989). গ্রন্থের চতুর্থ প্রচ্ছদে উদ্ধৃত আইনস্টাইনের মন্তব্য।

২. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গান্ধী রচনাসম্ভার–পঞ্চমখণ্ড (সম্পাদক : 'সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি), (কলকাতা : ১৯৭০), পৃ. ৪২৩-২৫

৩. পান্নালাল দাশগুপ্ত, গান্ধী গবেষণা (কলকাতা : ১৯৮৬), পৃ. ২০৭-০১

৪. Nirmal Kumar Bose, 'Selections from Gandhi' (Ahmedabad, 1948), P. 107

৫. D. G. Tandulkar, 'Mahatma'-Vol. 111 (Bombay, 1949), P. 217

৬. M. S. Deshpande, 'Light of India : Message of the Mahatma' (Bombay : 1958), P. 141

৭. অম্লান দত্ত, 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' (কলকাতা : ১৯৮৬), পৃ. ৭০

৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' (কলকাতা : ১৯৮৯), পৃ. ১১৭

৯. Hymayun kabir, 'Gandhi's Revolutionary Significance' in Radhakrishnan (ed.), Mahatma Gandhi : 100 Years (Delhi : 1967), P. 88

১০. পান্নালাল দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

শিপ্রা সরকার
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

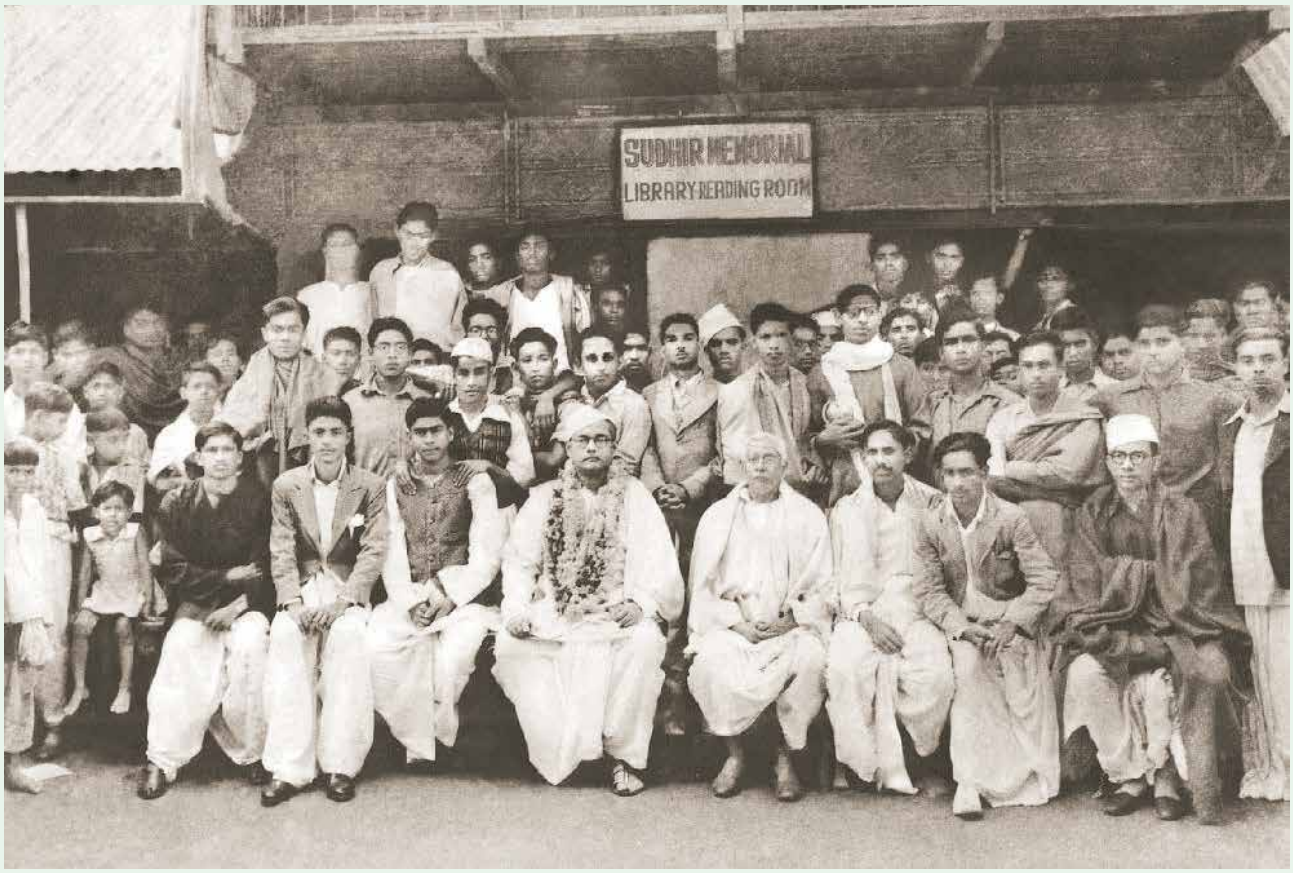

বরিশালে সুধীর মেমোরিয়াল লাইব্রেরির রিডিং রুমে অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু, মে ১৯৪০। ছবিঋণ : রাষ্ট্রদূত মাহবুব আলম/ওয়াকার এ খান।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পূর্ববঙ্গে নেতাজি সুভাষ

আশরাফুল ইসলাম

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুষে ওঠা দুই অঞ্চল–বাংলা ও পাঞ্জাব। পরাক্রমশালী ঔপনিবেশিক শক্তির রুদ্ররোষের সামনে প্রবল বিক্রমে এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীরাই সর্বাগ্রে নিজেদের সাহস ও শক্তির জানান দিতে পেরেছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পরাধীন ভারতে জন্ম নেওয়া এমনি এক সূর্যসন্তান যাঁর সংগ্রামী জীবন ও আত্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের আদি ও অকৃত্রিম সংগ্রামী চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। যদিও সুভাষচন্দ্র বসু জন্মেছিলেন উড়িষ্যার কটকে কিন্তু তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তাকে অতি আপন করে নিয়েছিল। তুমুল জনপ্রিয় যুবনেতা, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিরূপে, পরবর্তীতে দুবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি কিংবা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের পুরোধা হিসেবে তাঁর যে সরব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাতে পূর্ববঙ্গই তাঁকে সর্বাগ্রে সাদরে গ্রহণ করেছিল। দেশভাগের ট্রাজেডির পর অত্যন্ত সচেতনভাবে পূর্ববঙ্গে নেতাজিসংক্রান্ত বহু তথ্য-উপাত্ত যেমন হেলায় বিলীন করা হয়েছে, তেমনি সত্যান্বেষী ইতিহাস গবেষকদের কাছেও তিনি নিদারুণভাবে ব্রাত্য থেকেছেন

২০ মে ১৯৪০, ঢাকায় জনসমাবেশে বিশাল শোভাযাত্রায় সুভাষচন্দ্র বসু
(ছবিঋণ: লুৎফুল হক/ওয়াকার এ খান)

১৯২৪ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মৌলভী আশরাফউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অন্যদের সঙ্গে যুবনেতা শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুও রয়েছেন। পরবর্তীতেও বারবার তিনি ছুটে আসেন পূর্ববঙ্গে। কংগ্রেসের তুমুল জনপ্রিয় যুবনেতা হিসেবে ১৯২৯ সালের ৩০ মার্চ রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ছাত্র-যুব-প্রাদেশিক-রাজনৈতিক সভায় সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র বসু। ২১ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলন, ২৫ এপ্রিল শ্রীহট্ট জেলা ছাত্র-সম্মিলনী, ২২ জুন যশোহর-খুলনা যুব সম্মেলন, ৭ জুলাই যশোহর জেলা সম্মেলন, ১৮ জুলাই বরিশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন এবং ১৭ আগস্ট রাজশাহী জেলা ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। (সূত্র : সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ/অনৈক্য থেকে ঐক্যে : ড. জয়ন্ত চৌধুরী)

পূর্ববঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর এই বিচরণ এই অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে আরও প্রবল করে। নেতাজি সুভাষের এসব জনপদে বারবার আসা, তাঁর আবেগমথিত বক্তৃতার প্লাবনে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালের ইতিহাসে তা স্থান পেয়েছে সামান্যই। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সুভাষ জনক-জননী জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবীর একটি গভীরতম সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল পাবনার হেমায়েতপুরে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে। হেমায়েতপুরে আশ্রম সংস্কারে সুভাষ-জননী প্রভাবতী দেবী নিজ হাতে ইট বহন করেছিলেন। জননীর এই ভক্তি পুত্র সুভাষকেও প্রভাবিত করেছিল। সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। (সূত্র : নেতাজির মা : ড. জয়ন্ত চৌধুরী)

নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরীর প্রবন্ধে রয়েছে, 'প্রথমবার অনুকূলচন্দ্র অসুস্থ থাকায় দেখা না হলেও কয়েক বছর পর সুভাষচন্দ্র হিমাইতপুরে যান মা'য়ের নির্দেশে। হিমাইতপুরে গিয়ে সুভাষচন্দ্র ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'দেশের তো নানা কাজই করবার আছে। তা দেশের প্রকৃত সেবা করতে হলে কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে? এবিষয়ে আপনার মত কি? জানা যায়, দেশ ও মানুষ গড়া বিবাহ-সংস্কার, আদর্শ শিক্ষা, পরিবার-পরিজনসহ আশ্রমজীবন-যাপন ইত্যাদি বিষয়ে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। সৎসঙ্গ আশ্রম দেখে সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু একান্তে কোনো কথা বলার সুযোগ হয়নি।'

এক স্মৃতিচারণে জানা যায়, 'সুভাষচন্দ্র আরেকবার হিমাইতপুর আশ্রমে এসেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের বেশকিছুদিন পূর্বে। সুভাষ তখন জননেতা হিসেবে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাই তিনি আশ্রমে আসলে এত অত্যধিক লোকের সমাগম হল যে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎমাত্রই হল, কোন কথা বলার সুযোগ হল না। তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন–শ্রীশ্রী ঠাকুরকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করব বলে এসেছিলাম, এত লোকের ভিড়ে তা আর সম্ভব হল না। আমি বললাম–আসুন। আমি লোক সরিয়ে দিয়ে, যাতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে প্রাইভেটলি কথা বলতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করে বললেন–এত লোকের অসুবিধা করে তা করতে চাই না।' (মানসতীর্থ পরিক্রমা, সুনীল বসু : পৃষ্ঠা ১৮০)

১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ ফরওয়ার্ড ব্লক আয়োজিত এক কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে নেত্রকোনায় এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজির নেত্রকোনা সফরে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম এন রায়)। (সূত্র : নেত্রকোনায় নেতাজির স্মৃতি : সুমিত্র সুজন, বহুমাত্রিক ডটকম)। জানা যাচ্ছে, শহরের ঘৃত ঘরের পেছনে এক কাছারি ঘরে (বর্তমানে অবলুপ্ত) বিশ্রাম নিয়েছিলেন নেতাজি। তৎকালে আব্দুল মজিদ এমপি (তারা মিয়া), জ্যোতিষ জোয়ার্দারসহ অনেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে দিচ্ছিলেন। নেতাজির উপস্থিতিতে ওই সভাটি হয়েছিল শহরের বালক সাহার গুদামে। কলকাতার মেয়র এবং পরবর্তীতে প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রী নলিনী রঞ্জন সরকারও এসময় উপস্থিত ছিলেন। নেতাজি ট্রেনযোগে নেত্রকোনা এসেছিলেন এবং বড় স্টেশনে নেমেছিলেন।

নেতাজির নেত্রকোনার সেই সফরে হৃদয়স্পর্শী এক ঘটনার কথা জানান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ননী গোপাল সরকার। তিনি উল্লেখ করেন, 'বাবার মুখে শুনেছিলাম, তিনি দেখেছিলেন, বেঙ্গল গভমেন্টের অর্থমন্ত্রী নলিনী রঞ্জন সরকার একটি রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই রিক্সায় বসা ছিলেন স্বয়ং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং এম এন রায়। ভিড় ছিল উপচে পড়া। নেতাজী হাত নেড়ে সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন।'

নেতাজির পূর্ববঙ্গের সঙ্গে এই গভীর সংযোগের ফল আমরা দেখি, তিনি যখন দেশত্যাগ করে বিশ্বশক্তির সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাতে এই অঞ্চলের বহু তরুণ যোগ দিয়েছিলেন। নেত্রকোনার মহেশ্বরখিলা গ্রামে সুরেন্দ্র কিশোর সোম নামে আজাদ হিন্দ ফৌজের এক যোদ্ধার সমাধি সেই সত্যকেই মান্যতা দেয়।

যশোরে নেতাজি একাধিকবার এসেছেন। যশোহর শহরেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইলা বসু মিত্রের বাড়ি ছিল (বাড়ির অস্তিত্ব বর্তমানেও রয়েছে, তবে হাত বদল হয়ে বাড়িটিতে নেতাজির কোনো স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করা হয়নি)। যদিও শহরের কোতোয়ালি মোড় থেকে দড়াটানা পর্যন্ত সড়কটি 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সড়ক' হিসেবে বিরাজমান। এই সড়কে স্বদেশের মুক্তির জন্য প্রতিবাদী শোভাযাত্রা নিয়ে পুলিশবেষ্টিত হয়ে প্রদক্ষিণ করেছিলেন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু।

বাংলাদেশের নানাপ্রান্তে নেতাজি সুভাষের স্মৃতিচিহ্নের খোঁজ মিলছে। তেমনি একটি স্থান মানিকগঞ্জের বালিয়াটি পুরাতন বাজার কালীমন্দির। মন্দিরের পাশে নেতাজির পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্যের উপস্থিতি। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নেতাজির এই ভাস্কর্যটি মন্দিরের পাশের পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর রোষানল থেকে বাঁচাতে। মানিকগঞ্জে নেতাজির আগমনের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতে (আগমনের সময়কাল জানা যায়নি) সুভাষভক্ত স্থানীয় প্রমোদ কর্মকার নিজ প্রচেষ্টায় গড়েছিলেন এই ভাস্কর্য। স্থানীয় মন্দির পুরোহিত প্রসাদ চক্রবর্তীর ভাষ্যে, একাত্তরের পর স্বাধীন দেশে বহুদিন জলে ডুবে থাকা নেতাজির কথা মানুষ ভুলেই গিয়েছিল। একবার পুকুর শুকিয়ে খননকার্য চালাতে গিয়ে বেরিয়ে আসেন 'কর্দমাক্ত নেতাজী'। আঘাত লেগে নাকের পাশে খানিকটা ক্ষতিগ্রস্তও হয়। কিন্তু স্থানীয়দের

সিলেটে (মে ১৯৪০) এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণরত সুভাষচন্দ্র বসু। ছবিঋণ: লুৎফুল হক/ওয়াকার এ খান।

ভালোবাসায় মন্দিরের পাশে দণ্ডায়মান হন তিনি। এখানে ধূলিমলিন রূপে বাঙালির অখণ্ডগৌরব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আজও।

সাম্প্রতিক বছরে প্রকাশিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধিৎসু ওয়াকার এ খানের Glimpses of Netaji in East Bengal শীর্ষক নিবন্ধে নেতাজি সুভাষের পূর্ববঙ্গে আসার বেশকিছু প্রামাণ্য স্থিরচিত্র দেখতে পাচ্ছি, যাতে ১৯৪০ সালে মাদারীপুর, বরিশাল, সিলেট ও নারায়ণগঞ্জে বিপুল জনসংবর্ধনায় সিক্ত হচ্ছেন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রিয় সুভাষচন্দ্রকে এই 'দেশনায়ক' অভিধায় অভিষিক্ত করেছিলেন। কলকাতায় মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কবিকে এভাবে সম্বোধন করতে শোনা যায়)।

নেতাজির প্রতি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর অনুরাগ ও পূর্ববঙ্গে তুমুল জনপ্রিয়তার কথা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে উল্লেখ রয়েছে। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র নবম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণদাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হতো, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী। পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার ওপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমার মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হলো। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম। গোপালগঞ্জের সেই সময়ের এসডিও, আমার দাদা খান সাহেবকে একদিন হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, এ গল্প আমি পরে শুনেছি।'

নেতাজিকে ঘিরে এমন বহু আখ্যান আমরা হয়তো আজ হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে মন্ত্র এই ভূমি থেকে উত্থিত হয়েছে নিশ্চিতভাবেই আমরা বলতে পারি, বীর সুভাষের চেতনা তাতে মিশে রয়েছে।

কংগ্রেসের বলিষ্ঠ মুখ সুভাষচন্দ্র বসু ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীদের বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও উৎসাহ জোগাচ্ছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া যে ব্রিটিশদের তাড়ানো যাবে না, এই নীতির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু ও সূর্য সেনের ঐক্যমতের ফলে বাংলাসহ গোটা ভারতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আরও বেগবান হতে থাকে। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের কাউন্সিলে সম্পাদক হন সূর্য সেন। ব্রিটিশদের সমুচিত জবাব দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাষ্টারদা সূর্য সেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাতে অবিস্মরণীয় যে বিদ্রোহের সূচনা করেন (চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ নামেই পরিচিত), যা পরবর্তী ১৭ বছরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি-প্রকৃতিকেই বদলে দেয়।

১৯৪০ সাল। সুভাষচন্দ্র বসু ভারত ত্যাগের পূর্বে শেষ সফর করেন পূর্ববঙ্গে। শেষবার সফরে স্থানীয় দেব জমিদার পরিবারের আতিথ্যে চট্টগ্রাম শহরের পাথরঘাটায় অবস্থান নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে কর্ণফুলী নদীতে রেকি করেছিলেন। মাস্টারদার ঘনিষ্ঠ অনেক বিপ্লবীই তখন সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যধন্য হন। স্বাধীনতার জন্য বীরচট্টলার বিপ্লবীদের প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ সুভাষচন্দ্রকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে আমরা দেখব, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আইএনএ) স্বদেশের মুক্তির পথ রচনায় ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের পরিকল্পনা নিয়েছিল বীর চট্টলার মধ্যদিয়ে। চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতো মহৎপ্রাণ বিপ্লবীরা নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজকে বরণের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১৯২১ সালের ১৪ মার্চ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ চট্টগ্রামে এলেন। তাঁর এই সফর চট্টগ্রামে স্বাধীনতার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। গবেষক আহমেদ মমতাজ সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে লিখেছেন, '... চরমপন্থী বিপ্লবী নেতাদের অনুসরণে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হননি। ইতিমধ্যে প্রবীণ বিপ্লবী নেতা যামিনীকান্ত সেন, পুলিনচন্দ্র দাশ, রঞ্জনলাল সেন, হরিশ্চন্দ্র দত্ত ও বেণী মাধব দাশ প্রমুখ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। তাদের পরিবর্তে নেতৃত্বে আসেন সূর্য সেন, গিরিজা শংকর চৌধুরী, চারু বিকাশ দত্ত, অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল কুমার সেন। তাঁদের গতিশীল নেতৃত্বে দলে যুক্ত হন বহুসংখ্যক তরুণ-যুবক।'

এই যখন চট্টগ্রামের পরিস্থিতি তখন এক অপূর্ব যুগলবন্দি রচিত হয় কলকাতায়, ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনকে ঘিরে। এখানেই চিরবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আরেক আজন্ম বিপ্লবী সূর্য সেনের গভীর সম্মিলন রচিত হয়। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সেই অধিবেশনে উপস্থিত স্বয়ং গান্ধী, মতিলাল নেহেরুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ। তারুণ্যে উদ্দীপ্ত সামরিক পোশাকে অশ্বারোহী সুভাষচন্দ্র বসু বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রণসাজে কুচকাওয়াজ দলের অভূতপূর্ব উপস্থিতি চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীদের মনে আনন্দের

চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় দেব জমিদার পরিবারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু। ছবিঋণ : তনুশ্রী দে ॥ মাদারীপুর সফরে এক চা চক্রে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু মে, ১৯৪০)। ছবিঋণ: লুৎফুল হক/ওয়াকার এ খান ॥

হিন্দোল বইয়ে দেয়। চট্টগ্রামে ফিরে সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'।

এদিকে ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ৬৩ দিন অনশন করে লাহোর জেলে মৃত্যুবরণ করেন বিপ্লবী যতীন দাস। যতীন দাসের মৃত্যু গোটা ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তোলে। অশ্রুসিক্ত বদনে ব্রিটিশকে চূড়ান্ত আঘাত হানার শপথে হাওড়া স্টেশন থেকে 'ভারত দধীচি' যতীন দাসের নিথর দেহ গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ও পরবর্তীতে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অসংখ্য শহরে প্রতিবাদী মিছিলে কেঁপে ওঠে দেশ। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে প্রতিশোধপাগল বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে প্রস্তুতি এগিয়ে নিতে থাকেন।

১৯২৯ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রামে কংগ্রেসের জেলা সম্মেলন আহুত হয়। সম্মেলনে কলকাতা থেকে আসেন সুভাষচন্দ্র বসু, নগেন্দ্র ব্যানার্জী ও লতিকা বসু। সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সম্মেলনে মহিমচন্দ্র দাশগুপ্ত সভাপতি ও সূর্য সেন সম্পাদক হন। যুব সংগঠনের নেতৃত্বে আসেন সূর্য সেনপন্থী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলসহ একঝাঁক তরুণ বিপ্লবী। যার মধ্য দিয়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বলয় থেকে পরিপূর্ণভাবে সুভাষচন্দ্র বসুর বলয় চট্টগ্রামের রাজনীতি অধিকার করে। যার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ প্রসারিত হয়।

গবেষক আহমেদ মমতাজ উল্লেখ করেছেন, 'চট্টগ্রামের সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন অংশ সুভাষচন্দ্র বসুর অনুসারী ছিলেন। ১৯২৮ সালের ৩০-৩১শে ডিসেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের প্রাক্কালে আগের রাতে ২৯শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের স্বাধীনতাপন্থী বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে জে সি গুপ্তের বাড়িতে এক সভা আহ্বান করেন। সেসভায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কয়েকজনের সাথে হাবীবুল্লাহ বাহার, মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রমুখ মুসলমান যুবক উপস্থিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র সভায় ঘোষণা করেন কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবে কবি নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গান দিয়ে এবং সমাপ্তি সংগীতও হবে নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' দিয়ে। সুভাষচন্দ্র জানান, এতে অবাঙালি নেতারা আপত্তি জানিয়েছিলেন কিন্তু সুভাষ হুমকি দেন এই বলে যে, 'আপত্তি করলে কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড করে দেব।'

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের কলকাতার ঐতিহাসিক অধিবেশন উপলক্ষে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলকে প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মীদল হিসেবে গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি ঘোষণা দেন এই স্বেচ্ছাসেবক দলকে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামে স্থায়ী দলে উন্নীত করা হবে। আর সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল হিসেবে 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি' অবিলম্বে গঠন করা হবে। (সূত্র : মাস্টারদা সূর্য সেন, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও তৎকালীন মুসলিম সমাজ : আহমেদ মমতাজ)

সুভাষচন্দ্রের আবেগমথিত সত্য উচ্চারণে সভায় প্রত্যেক সদস্য হাতের আঙুল কেটে রক্ত বের করে স্বাক্ষর করেন দলের শপথনামায়। অতঃপর কবি কাজী নজরুল ইসলাম শপথনামা পাঠ করান ও নিজের লেখা 'টলমল টলমল পদভারে/বীরদল চলেছে সমরে' গান গেয়ে সভার সমাপ্তি করেন। সেই সময়কার ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়ন করে একথা আমরা দৃঢ় চিত্তেই বলতে পারি, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্তপর্বের কাণ্ডারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর মাতৃমুক্তির সাধনায় সংগ্রামের যে পথকে বেছে নিয়েছিলেন একজন মাস্টারদা সূর্য সেন ও তাঁর অকুতোভয় সহযোদ্ধারা তা বাস্তবায়নে প্রথমেই এগিয়ে এসেছিলেন। মাস্টারদার নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল অবধি চারটি দিন ব্রিটিশ শাসন থেকে কার্যত চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যে মহাউপাখ্যান সৃষ্টি করেছিলেন-তা দারুণভাবে উদ্বেলিত করে সুভাষচন্দ্র বসুকে।

সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

নেতাজি অনুরাগী ওয়াকার এ খান তাঁর 'নেতাজি সুভাষ বোস ইন চট্টগ্রাম' শীর্ষক লেখায় তুলে ধরেছেন নেতাজির চট্টগ্রাম সফরের সময়কার ইতিবৃত্ত। সেই লেখায় আমরা জানতে পারছি, ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকার সময়ে চট্টগ্রাম সফরে সুভাষচন্দ্র বসু যে রাজকীয় অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন ১৯৪০ এ সদ্যসাবেক সভাপতি হওয়ার পরও তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। তিনি চট্টগ্রামের দেব জমিদার পরিবারের পরম আতিথ্যে পুরো সময়টা স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছিলেন। সেই সফরের যেসব ছবি পাওয়া যাচ্ছে এবং তার বিবরণ তুলে ধরে জমিদার পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের তনুশ্রী দে জানাচ্ছেন, ওই সফরে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্বয়ং জমিদার নবীনচন্দ্র দেব বর্মন সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ছবিতে অনেকের সঙ্গে জমিদার পরিবারের সদস্য উর্মিলা দেব বল ও তাঁর স্বামী সুবোধ বলকেও দেখা যাচ্ছে। সুবোধ বল মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম সহযোগী এবং জালালাবাদ পাহাড় যুদ্ধে আহত বিপ্লবী লোকনাথ বলের ভাই। গোয়েন্দা নজরদারির মাঝেও সুভাষচন্দ্র বসু যে চট্টগ্রাম সফরে বিপ্লবীদের সঙ্গে একাধিক সভায় মিলিত হয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমনকি তখন চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতো মহৎপ্রাণ বিপ্লবীরা নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজকে বরণের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চট্টগ্রামে সবশেষ সফরে নেতাজি সুভাষের গোপন কর্মকাণ্ডের যে বয়ান আমরা পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে পাচ্ছি, তাতে এটি স্পষ্ট যে সুভাষচন্দ্র বসুর গোপনে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে চট্টগ্রামের সফর ছিল একটি পূর্বপ্রস্তুতির অংশ।

'বিপ্লব ঐতিহ্যে চট্টগ্রাম' শীর্ষক গ্রন্থে সাংবাদিক ও লেখক শচীন দত্ত উল্লেখ করছেন, 'অবিভক্ত ভারতের পেশোয়ার থেকে পূর্ব সীমান্ত চট্টগ্রাম এবং হংকং অবধি এর এলাকা বিস্তৃত ছিল। বাংলার সমুদ্রসংলগ্ন দ্বীপ অঞ্চল সন্দ্বীপ, সুন্দরবন এবং বালেশ্বরে যে অস্ত্র সংগ্রহের স্থান চূড়ান্ত হয়েছিল তার প্রথমটিই বিশ্বাসঘাতকদের কারণে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

বেঙ্গল পলিটিক্যাল কনফারেন্সে (মে ১৯৪০) নারায়নগঞ্জে মাল্যভূষিত সুভাষচন্দ্র বসু। ছবিঋণ : লুৎফুল হক/ওয়াকার এ খান ॥ ১৯২৪ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় সাধনা ঔষধালয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মৌলভী আফরাফ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু। ছবিঋণ: নজরুল অ্যালবাম, নজরুল ইনস্টিটিউট।

চট্টগ্রামেও তাই হয়েছিল তবে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। এই ধারায় নেতাজী পরবর্তীতে অগ্রসর হয়েছিলেন।'

তিনি গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন, '১৯৩৮-৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি (নেতাজী সুভাষ) দুবার চট্টগ্রামে এসেছিলেন। চট্টগ্রামকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসেছিলেন। অবশ্য তাঁর কারণও বিবিধ। প্রথম ভ্রমণ ছিল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে (১৯৩৮)। দ্বিতীয়বার তাঁর চট্টগ্রামে আসা ছিল কংগ্রেস পরিত্যাগ করার পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে। এই সময়ে তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম একটি স্থান ছিল প্রবর্ত্তক সংঘ। প্রবর্ত্তকের পাহাড়ের ওপর থেকে তিনি চট্টগ্রামকে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। নেতাজি বলেছিলেন, 'এমন সর্বাংশে সুন্দর দেশ, ইচ্ছা হয় এখানেই কিছুকাল থেকে যাই।'

'এই প্রবর্ত্তক পাহাড়ের ওপর থেকে 'পলাশীযুদ্ধ' খ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের বাড়ী 'রম্য শৈল' বাড়ীটি দেখে নেতাজি সুভাষ বলেছিলেন, 'এই নবীনচন্দ্রই তো ছিলেন বাংলার স্বাদেশিকতা উদ্বোধনের অন্যতম কবি'–লিখেছেন শচীন দত্ত।

এই গ্রন্থে আরও জানতে পারি, ১৯৪০-এ পুনরায় যখন তিনি চট্টগ্রামে এলেন তখন চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্বদেশী সংস্থা ও সংগঠন তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এমনি একটি আয়োজন ছিল চট্টগ্রামের ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. কে কে সেন, সুপারিনটেনডেন্ট ডাইরেক্টর রায় বাহার উপেন্দ্রলাল রায়ের উদ্যোগে একটি চা পানের অনুষ্ঠান। সেদিন অনুষ্ঠানের সময় বিকাল চারটা বেজে যাওয়ার পরেও তিনি ঐ অনুষ্ঠানে আসেননি। সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় এই অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন এবং এই অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের কাছে বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

উল্লিখিত বিলম্বের বিষয়ে ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক শচীন দত্ত লিখেছিলেন, 'তাঁর (নেতাজি) কর্মসূচির অতিরিক্ত সময়ে, তিনি সেদিন বিকেলবেলায় কোথায় গিয়েছিলেন তা তাঁর দু-তিন জন রাজনৈতিক অনুগত সদস্য ছাড়া কেউ জানত না। সাংবাদিক হিসেবে ভোর থেকে সন্ধ্যার পর অবধি তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। আমিও এই ব্যাপারে কিছুই জানতে পারিনি। পুলিশ বিভাগের গুপ্তচরেরা তাঁর গতিবিধির ওপরে লক্ষ রেখেছিলেন কিন্তু তারাও এই বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি। বরং তাঁরা শচীন দত্তকেই খোঁজ করেছিলেন এই বিষয়ে কিছু জানার জন্য।'

পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক শচীন দত্ত নেতাজি ও কয়েকজনকে নিয়ে যে সাম্পানটি কর্ণফুলীর মোহনার দিকে গিয়েছিল সেই সাম্পানের মাঝির নাগাল পেয়ে যান। এবিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'তাঁর (মাঝি) কাছ থেকে নেতাজির সঙ্গে থাকা তিনজন যাত্রীর খোঁজ পাই। একজন ছিলেন বিপ্লবী চন্দ্র শেখর দে এবং অন্য দুজন চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁরা বঙ্গোপসাগরের মোহনার দিকে গিয়ে নানা কথাবার্তা বলেছিলেন। ১৯৩৮ ও ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম সফরের সময় তিনি অনেকবার এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া লাইফ ইন্স্যুরেন্সর এজেন্ট হরেন্দ্র দত্ত রায়ের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার ফোনে কথাবার্তা বলেছিলেন; বেশ কয়েকবার দরোজা বন্ধ করে।'

শচীন দত্ত আরও লিখেছেন, 'আই. এন. এ'র সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব বার্মা (অধুনা মায়ানমার) সীমান্ত দিয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করার পরিকল্পনা নিয়ে বেশকয়েকজন যুবক খুবই গোপনভাবে কর্মরত ছিলেন। চট্টগ্রামকে নিয়ে নেতাজি সুভাষ বোসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হয়তো ছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের একটি অন্যতম কেন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাছে চট্টগ্রাম একটি অন্যতম নিশ্চিত প্রবেশমুখ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল এটি বলা যায়।'

'চট্টগ্রামের বিপ্লবের বহ্নিশিখা' গ্রন্থে (শচীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত, প্রকাশকাল ১৯৭৪) প্রকাশ, '১৯২৪-২৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম জেলায় বোধকরি ছাত্র সংগঠন আদর্শগত কারণে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি সংগঠন ছিল কংগ্রেস অর্থাৎ গান্ধীবাদী বা মডারেট আন্দোলনের পক্ষে এবং অন্য দলটি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপক্ষে। প্রথমটি এ বি এস এ এবং দ্বিতীয়টি বি পি এস এ। চট্টগ্রামের সূর্য সেন সমর্থিত ছাত্র সংগঠনটি এই দলের (বি পি এস এ) সদস্য ছিলেন। নেতাজী সুভাষ বোস এই দলটির সমর্থক ছিলেন। মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে নেতাজী সুভাষ বোসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।'

একাধারে খেলাফত আন্দোলনের নেতা, সাংবাদিক ও বিপ্লবী মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর যে গভীর সংযোগ পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই সেটিও ভারতের চূড়ান্ত মুক্তির অভিযানকে জয়যুক্ত করার প্রচেষ্টার অংশ। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ বার্মায় অবস্থানকালে একাধিকবার যাতায়াত করেছিলেন। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের নিকটে জঙ্গলাকীর্ণ একটি স্থানে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আজাদ হিন্দ ফৌজের গোপন ঘাঁটি নির্মাণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং লালকেল্লায় তাঁর বিচার হয় অন্যান্য রাজবন্দিদের সঙ্গে। সেখানে তিনি নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। (সূত্র : ইতিহাসবিদ সুনীতিকুমার কানুনগো)

পূর্ববঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিচরণের বহু তথ্যই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত। তবে তুলনামূলক অনুসন্ধান ও অধ্যয়নে এটি জানা যায়, ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে ২০ মে, ১৯৪০ ঢাকায় একটি রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতৃত্বদানের ছবিটিই সব শেষ আলোকচিত্র। আমরা প্রত্যাশা করব, আগামীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তি ও পুরোধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অজানা অনেক তথ্য প্রকাশ্যে আসবে এবং নবপ্রজন্মকে দেশপ্রেমে প্রাণিত করবে। •

আশরাফুল ইসলাম
ইতিহাস গবেষক
চেয়ারম্যান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার
ফর নেতাজি সুভাষ আইডিওলজি, ঢাকা

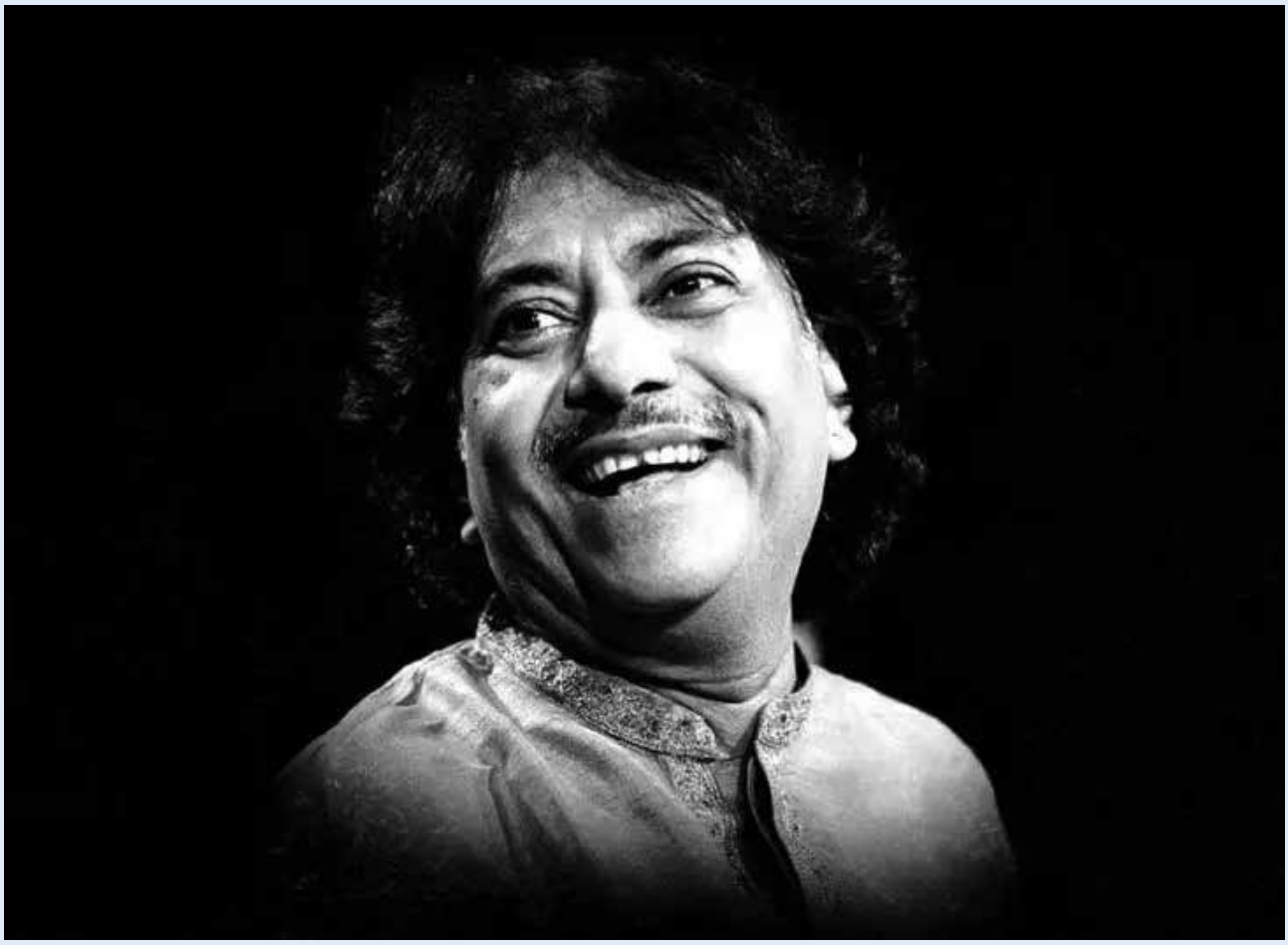

জন্ম : ১ জুলাই ১৯৬৮ • মৃত্যু : ৯ জানুয়ারি ২০২৪

উস্তাদ রশিদ খান
গান্ধর্বের মূর্তরূপ

ড. সাইম রানা

প্রয়াণ

রশিদ খান এমন এক মহান সংগীতকার, যার সম্পর্কে চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষ বলেছিলেন 'গান্ধর্বের মূর্তরূপ।' ভীমসেন যোশী বলেছিলেন, 'Rashid Khan was the 'assurance for the future of Indian vocal music.' এরকম এক মহান সাধককে যেকোনো শব্দ-বিশেষণ দিয়ে স্তুতি জ্ঞাপন করাই বরং সীমাবদ্ধতা টেনে আনে। তবে তাঁর অকালপ্রয়াণে সুর আস্বাদনকারী ভক্তবৃন্দের অনুতাপ ও শোকের সঞ্চার করেছে ষোলো আনা। শিল্পীমহলে একটি কথা প্রচলিত আছে যে দরবারি সংগীত গায়কদের কণ্ঠের দীপ্তি ও মাধুর্যের উত্তুঙ্গ সময় হলো পঞ্চাশ থেকে ষাট। এখানেই অনুতাপ যে মাত্র ৫৫ বছরেই জীবন ও শিল্পের সাথে তাঁর অব্যাহতি ঘটল, এতদিন শ্রোতাকে যে ধ্বনিরশ্মিতে চমকিত ও বিগলিত করেছেন, আগামীদিনে হয়তো দুঃখ প্রশমনের চৈতন্যে অবগাহনে প্লাবিত করতেন আলাপে ও বিস্তারে, তারও অবসান হলো। গত ৯ জানুয়ারির ২০২৪-এর পর আধুনিক সাংগীতিক স্থাপত্যের ঢেউ থমকে গেল। কেন তা বলছি? কারণ আধুনিকতা সবসময় বুদ্ধিদীপ্ত প্রখর নির্মাণের পক্ষে থাকে তা মৌলিক হোক আর যৌগিক হোক

রশিদ খান যে সুরের কাঠামো গড়তেন তা ছিল রামপুর-সাসওয়ান ঘরানার ভিত্তিতে, কিন্তু কাঠামোর ভেতরে-বাইরে প্রাসাদোপম রঙের নকশা আঁকতেন কিরানা ঘরানার পুকার দিয়ে। আর রত্নখচিত আসবাবপত্র দিয়ে পূর্ণতা আনতেন কণ্ঠের উদাত্ত-দৃঢ় অথচ সুমিষ্ট কিংবা ধ্যানী-স্থির আলাপে-বিস্তারে।

রাগ-রাগিনীর কালোয়াতি সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে, সুরকে নানা লয়ে-ভেঙে এমন এক আশ্চর্য দক্ষতা প্রকাশের কথা বলা হয়, যা শ্রোতার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হয় না, অথবা সম্ভব হলেও পারঙ্গমতা থাকে না। অনেক বিচিত্র লয়ে ও লয়কারি দিয়ে স্বরসাধনার মাধ্যমে সেই দক্ষতা অর্জন করতে হয়, যা দর্শককে জাদুর অলৌকিক কাণ্ড দেখার মতো বিস্মিত করে, অথচ অনুকরণ করলে সেই ব্যাপ্তি ধরা দেয় না। এরকম অনাস্বাদিত দক্ষতা অর্জনেই মূলত রাগসংগীতের পেশাদারিত্ব গড়ে ওঠে।

২০১৬ সালে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে বেঙ্গল মিউজিক ফেস্টিভ্যালে উস্তাদ রশিদ খানের পরিবেশনায় রাগ ললিত শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল রাতের শেষ প্রহরে। এই শেষ প্রহরের রাতটি আমাদের কাছে ছিল তন্দ্রালু ও নেশা ধরা মন্দ্র সপ্তকে দীর্ঘ আলাপের ঘোরলাগা মুগ্ধতার এক আশ্চর্য মুহূর্ত। দিনটি ছিল ২৬ নভেম্বর এবং ফেস্টিভ্যালের তৃতীয় দিন। বন্দিশের বিষয় ছিল ভোরের এই সময়ে যোগী বা সাধুকে জেগে ওঠার জন্য আহ্বান। আধুনিকতা, কৌশল এবং দক্ষতার অসাধারণ প্রয়োগে তিনি যেন অন্ধকারের ভেতর টুকরো টুকরো সূর্যরশ্মিকে স্বর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করছিলেন। এরপর দ্রুত লয়ে তারানা এবং ঠুমরি পরিবেশন করেছিলেন। ললিতে তিনি তানগুলোকে বক্র ও সপাট তানে খাদ থেকে উঁচুতে সুরের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন গমকের দুর্লভ সব কারুকাজ প্রদান করে। তার সাথে মুরাদ আলী খানের এস্রাজে অসম্ভব বক্র চলনের কালোয়াতি ও অজয় যোগলেকারের হারমোনিয়ামে শিশির পতনের মতো সুরের সঙ্গত যেন শীতের কুয়াশা ভেদ করে উষার উদয় ঘটছিল। তবে কখনো কখনো মনে হয়েছিল সূর্য ওঠাও কিন্তু সহজ নয়, মুড়কি তানের রাগদারিতে মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারের যত বাধা ভেঙেচুরেই সূর্যকে উঠতে হয়, ঠিক তেমনি। (ইউটিউব : Bengal 2016) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন রশিদ খানের ওই দিনের পরিবেশনা সম্পর্কে বলেছে–

'His magical taankari, ragdari, mesmerising meend, murki, sargam combination, bakro and sapat taan performance, immaculate gamak, speedy ascending and descending in three octaves, rare fondness of bolbistar and immersing in swar during the performance were outstanding.' (Bengal 2016)

এইদিন তিনি দক্ষতার সব ঝাঁপি খুলে নতুন নতুন তান ও লয়কারির চমৎকারিত্বকে উপস্থাপন করেছিলেন, যা হরহামেশা করতে দেখা যায় না। চমৎকারিত্বের বাইরেও আরো কিছু নিদর্শন আছে, যা শ্রোতাকে ধ্যানস্ত করে এবং মীমাংসা করে জীবন বোধের অনেক প্রশ্নের, দক্ষতার চমৎকারিত্ব কানকে উদ্দীপিত করতে পারলেও সবসময় বিশ্বস্ত করতে পারে না। সেজন্যে প্রয়োজন হয় বিস্তারের। রাগ-সংগীতের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে, সেখানে বিস্তার করা হয় মূলত রাগের রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। রশিদ খান সেই রূপকে ফুটিয়ে তুলতেন 'পুকার' দিয়ে, যা তার মধ্যে ধ্বনির অনুভূতিগুলো প্রকাশিত হতে গিয়ে একটি নৈসর্গিক আবহ তৈরি করে। পাহাড়ের পর পাহাড় নিকট থেকে দূরে যেমন কুয়াশা ও মেঘের জলকণার আস্তরে আস্তরে নিকটের গাঢ় রঙ দূরে ধোঁয়াশা বা ফ্যাকাশে হয়ে দেখা যায়। রশিদ খান কণ্ঠের নিয়ন্ত্রণে সুরের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতাকে কমিয়ে বাড়িয়ে (ডাইনামিক অর্থে) একটি মনোরম দৃশ্যমণ্ডলি সৃষ্টি করতেন, শ্রোতার মনের গভীরে সেই সুরের জাল দৃশ্যের রেখামালায় ভাসিয়ে নেয়, যা শুধুই কালোয়াতি দিয়ে সম্ভব হয় না। এখানেই রশিদ খান অন্যের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়, বিশেষ করে ইমন, সোহিনী, বেহাগ, দরবারি কানাড়া কিংবা হংসধ্বনি রাগে তিনি বিস্তার করতে গিয়ে শুরুতেই যে রাগের প্রকাশ ঘটাতেন তা অবিস্মরণীয়। তবে ঠুমরি গায়নের সূচনাতে যে মায়াময় আবেশ করা সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে দেখা যায় 'ইয়াদ পিয়া কি আয়ে' বন্দিশে, তা রশিদ খানের অতুলনীয় বিশেষত্ব, তারানার কথা না হয় নাই বললাম। তাঁকে মূল্যায়ন করতে ঋত্বিক ফাউন্ডেশন থেকে

রশিদ খান ভোপালের ভারত ভবনে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন

বলা হয়েছে–

His Music was a blend of exceptional precision and clarity in notes, His unique sense of rhythm, and his beautiful emotional expression of the notes and the lyrics. I think this male is really soulful and attaches to the hearts of the masses and the critics equally, His music strong classical base but it also has an attachment to modernity. (Rithwik 2024)

এই ধরনের দখলদারিত্বের পেছনে গুরুকুল ও একাডেমিক উভয়বিধ শিক্ষার সমন্বয় ব্যতীত আভিজাত্য প্রদর্শন প্রায় অসম্ভব। ঘরানাভিত্তিক বা গুরুকূল শিক্ষার সাথে একাডেমিক শিক্ষার যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে তা রশিদ খানের বিভিন্ন কথায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে কণ্ঠকে সুদৃঢ় করতে হলে সা-কে দিনের পর দিন একটানা সাধন করতে হয়। রামপুর-সাসওয়ান এবং গোয়ালিয়র ঘরানায় কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় অনুশীলন মূলত এতটা সুরের দখলদারিত্ব এনে দেয়, রশিদ খান বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেই কঠিন অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতেন। ভোর ৪টায় উঠে একটানা রেওয়াজ করা খুবই অস্বস্তির। এই বাধ্যবাধকতার ভেতর থেকে যে ধৈর্য ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের পরিণত রূপ তৈরি হয় তা একাডেমিক শিক্ষা পরিসরে সম্ভব নয়। এখান থেকেই ভিন্নজাতের ঐশ্বর্য তৈরি হয়। তিনি গুরুকুল ব্যবস্থায় সূর্যোদয়ের আগেই উঠে গুরু নিসার হোসেন খানের সাথে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন এবং অবিরত শুধু সা গাইতেন। এতে কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে যেতেন। পরে বুঝেছেন কণ্ঠের গুণগত উন্নতির জন্য এর বিকল্প নেই। তিনি বলছেন :

I studied under the Gurukul system. I would get up at 4 a.m. Guruji Nissar Hussain Khan would ask me to take the Tanpura and sing sur. That would go on and on. At times, I felt bored and would wonder why I had to sing the Sur always. Only later did I realise that it was to improve voice quality,Õ recalls the unassuming singer. (Jayakumar : Web)

গুরুপরম্পরার শিল্পীদের প্রধান স্বকীয়তা হলো ঘরানার নিজস্বতা ধরে রেখেই তাকে সম্প্রসারিত রূপ দেওয়ার সক্ষমতা। একাডেমিক শিক্ষায় মিশ্রণের মাধ্যমে নতুন ভঙ্গি তৈরি করে। কিন্তু ঘরানার শিল্পীগণ যে কোনো স্টাইলকে আরও ঐশ্বর্যময় করে তোলেন। রশিদ খান বলেন প্রত্যেক ব্যক্তির চেহারা যেমন আলাদা, এটাই তার পরিচয়ের মানদণ্ড। সেই আত্মপরিচয় গুরুর ঘরানার প্রতি আনুগত্য। এক্ষেত্রে তিনি খেয়ালে আলাপ দিয়ে শুরু করে বন্দিশে চলে যান। এরপর রাগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রেখে নতুন নতুন গতি নির্ধারণ করে অবশেষে সারগাম করে থাকেন।

তবে তিনি বিস্তারমুখি রাগকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে আবেগের সঞ্চার করতেন। বিস্তারমুখি রাগের মধ্যে কেদার, পুরিয়াকল্যাণ, বেহাগ, হংসধ্বনি, ললিত, মালকোষ, ইমন তাঁর প্রিয় ছিল। মালকোষ রাগে 'পীর না জানে বালামা', দরবারি কানাড়ায় 'হজরত তারুক মান লে', হংসধ্বনিতে 'লাগি লাগান পতি সজন সঙ্গ'সহ লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে 'সাজনা বারসে হায় কিউ আঁখিয়া', 'কা কারু সজনী আয়ে না বালাম।' বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এক্ষেত্রে তিনি আলাপে ও বিস্তারের সূচনাতেই অবরোহী পন্থা অবলম্বন করতেন, যা সাধারণত অন্য শিল্পীদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে আমরা ন্যারেটিভ থিয়েটারের ব্রেখটিয় ভাবনাকে একটু মিলিয়ে দেখতে পারি যে কাহিনির রহস্যকে আগেই ভেঙে দেওয়ার রীতির ন্যায় রাগের স্বরূপকে ভূমিকা আকারে উপস্থাপন করতেন। খেয়াল গায়কেরা সাধারণত যে রীতি অনুসরণ করে সেখানে আরোহী প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে স্বরের বিস্তার ঘটায় এবং রহস্যকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করে। কিন্তু রশিদের পরিবেশনার সূচনাতেই সেই রহস্যকে ভেঙে দিয়ে শ্রোতাকেও যেন পরিবেশনার বোধগত অংশিদারিত্বের অনুকূলে নিয়ে আসেন। এখানে এই অবরোহী প্রক্রিয়ায় রহস্যের মূল্য কম, রাগের পাপড়ি ধীরে ধীরে মেলে ধরা নাটকীয়তার তোয়াক্কা না করে অজস্র সুরের ঘ্রাণ উপলব্ধির বাগান করে তোলেন তিনি, এখানেই রশিদ খান অন্যের থেকে আলাদা। তার এই পরিণত রূপের প্রকাশ সম্পর্কে মধুমিতা দত্ত বলেন–

Rashid metamorphosed from a gawky, groaning child to an artiste of unbelievable maturity, vocal prowess and artistry under the tutelage of Ustad Nissar Hussain Khan, the Sahaswan Gharana Maestro. (Dutta 2008 : 49)

রশিদ খানের আরেকটি বিশেষ দিক হলো ক্লাসিক্যাল শিল্পী হয়েও সবধরনের সংগীতে কাজ সাবলিল পদচারণা। এমনকি সিনেমা ও ফিউশনধর্মী গানেও। সিনেমার গান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো মোহাম্মদ রফি কিংবা লতাজির মতো শিল্পী যেখানে সিনেমার গান গেয়ে আমাদেরকে সমঝদার শ্রোতা তৈরি করেছে, আমি তাদেরও উত্তরাধিকার। ফিউশন সম্পর্কে বলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের লঘু বা হালকা রূপগুলো সংযুক্ত করেই তো অন্যান্য গান দাঁড়িয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শাস্ত্রীয় নয় অথচ সেখানে কী অপূর্ব রাগের ব্যবহার রয়েছে। তবে সবার আগে প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক কঠোর রেওয়াজ। এতে সুখ আসবে আবার দুঃখও আসবে, তবে দুঃখের সময়েই গায়কীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রশিদ খান বলেন–

Music is like a prayer or offering to the almighty above. That's how I see it. And life is decided by that Supreme Being. I am contented. Just like happiness, sorrow is also part of life. When there is sorrow you are able to sing better. (Jayakumar : Web)

সংগীতের রেওয়াজ সম্পর্কে তিনি বলতেন, সাধনার ধারা দুইটি। একটি হলো গভীর মনোযোগের সাথে নিরলসভাবে সুরের দক্ষতা অর্জন করা, আর অন্যটি স্বরসাধনার মধ্যদিয়ে অজস্র সুরের রূপ ও রঙকে খুঁজে বের করা। তিনি আরো বলতেন রেওয়াজ মানে কিন্তু ঘণ্টা বা সময় ধরে চর্চা করা নয়। বরং রেওয়াজের বাইরেও সারাক্ষণ সুরের মধ্যে ধ্যানস্থ থাকাটাই মুখ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত তাকে অনন্য করেছে। সংগীত অনেকেই সাধনা করে, কিন্তু অনন্য হয়ে ওঠার পেছনে পারিবারিক উদার দৃষ্টিভঙ্গির একটি মূল্য আছে। বিশেষ করে মহীয়ান ব্যক্তিদের পেছনে মায়েদের অবদান আছে। রশিদ খান বলেন–

আমি যখন মায়ের পেটে, তখন মা নিসার হোসেন খাঁ সাহেবের রেওয়াজ শুনতেন ওঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। আর মনে মনে প্রার্থনা করতেন, আমার ছেলেও যেন তাঁর মতো বড়ো গাইয়ে হয়। এই একই প্রার্থনা ছিল মায়ের মায়েরও। আমার মা গোলাম মুস্তফা খাঁ সাহেবের ক্ষেত্রেও আমার দিদা এই প্রার্থনা করতেন।

শার্ঙ্গদেব রচিত 'সংগীতা রত্নাকর' মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় মাকে কখন কীভাবে সংগীত শ্রবণ ও অনুশীলন করতে হয়, সেই নির্দেশিকা হয়তো রশিদ খানের মায়ের হৃদয়গত ছিল। মায়ের আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা রাখতে গিয়ে সেই বদায়ুন থেকে সুদূর কলকাতায় এলেন পিতামহের হাত ধরে শিষ্যত্ব নিয়ে। ফলে একক গুরুর সাথে প্রাতিষ্ঠানিকতা উভয়ের অপরূপ অভিযোজন তাকে রাগদারির শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিল, অন্যদিকে বিচিত্র পর্যায়ে খোলা গান গাইবার মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। মজলিশি গায়কি থেকে চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক পর্যন্ত সর্বত্র সার্থক বিচরণ এনে দিয়েছিল। কারণ তাঁর পরিবেশনাগুলো সুরেলা ও স্পষ্ট। বন্দিশ শুনে শব্দ বোঝা যেত, আবার আলাপ অংশে আবেগপূর্ণ দ্যোতনা ধরা দিত প্রবলভাবে। রশিদ খানের রবীন্দ্রসংগীত গায়ন বাঙালির সংগীতকে সর্বভারতীয় মহিমায় আবর্তিত করেছে, এক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো তিনি এমনভাবে ভিন্ন এক গায়নশৈলী প্রয়োগ করেছেন যা পূর্ববর্তী কারুর গায়কীর সাথে মিল পাওয়া যায় না, আবার রবীন্দ্রপ্রবর্তিত সুরের কাঠামোর বাইরে বলেও সাব্যস্ত করা যায় না।

১৯৬৮ সালে পহেলা জুলাই তিনি দেবশিশুর বেশে আবির্ভাব করেছেন উস্তাদ ইনায়েত হুসেন খাঁ, উস্তাদ নিসার হুসেন খাঁর মতো খ্যাতিমান কুলীন সংগীত বংশে। কিশোর বেলায়ই গান গেয়ে দর্শনের মসনদে আসন পেয়েছেন, আবার রাজার বেশেই চলে গেলেন। তবে তাঁর রাজত্বের গুণাবলি হিসেবে কণ্ঠমাধুর্য অপেক্ষাও বিনয় ও অহিংসা তাকে অনেক বেশি উচ্চতায় তুলে ধরেছে যা ভারতীয় পদ্মভূষণ-বঙ্গবিভূষণসহ অসংখ্য সম্মাননা থেকেও বরং শ্রেয়। •

তথ্যসূত্র

১. Madhumita Dutta (2008), Let's know music and Musical Instruments of India, Ibs Books UK, ISBN-978-1-905863-29-7

২. Bengal Foundation (2016), Ustad Rashid Khan I Live at Bengal Classical Music Festival 2016, https://www.youtube.com/watch?v=XYXB9m5kdbU, Retrieved by 11.02.2023

৩. G. Jayakumar (2006), An offering to the Almighty' The Hindu, Online edition of India's National Newspaper, Friday, Sep 22, 2006. http://www.hindu.com/fr/2006/09/22/stories/2006092200610200.htm, Retrieved by 11.02.2023

৪. Rithwik Foundation for Performing Arts, A Tribute to Ustaad Rashid Khan, https://www.youtube.com/watch?v=zvci0I9Vm_0, Premiered Jan 14, 2024

৫. Sandeep Bagchee, (2008) NAD-Understanding Raga Music, eshwar : Mumbai, isbn-81-86982-07-8

ড. সাইম রানা
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জন্ম : ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ • মৃত্যু : ২৯ জুন ১৮৭৩

দ্বিশতজন্মবর্ষ

ঢাকায় মধুসূদন

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

কবি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৯৭৩) কলকাতা, মাদ্রাজ, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আবার কলকাতা, পঞ্চকোট ঘুরেফিরে জীবিকার্জন তথা ভাগ্য পরীক্ষা শেষে জীবনের অন্তিমপর্বে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় আসেন সম্ভবত আবারও ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। অস্থির, অতৃপ্ত এবং উচ্চাভিলাষী মধুসূদনের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বারবার অনিশ্চয়তায় ঝাঁপ দেওয়ার স্বভাবগত প্রবণতা, এক মধুসূদনের আরেক মধুসূদনকে স্রোতের মুখে ঠেলে দিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে দেখা কিংবা উদ্ধারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ যেন তাঁর জীবনের এক একটা অ্যাডভেঞ্চার। এটা যেন তাঁর নির্ধারিত নিয়তির তাড়নাও। ১৮৭১ সালে প্রথমবার মধুসূদন যখন ঢাকায় আসেন তখন তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। একটি মোকদ্দমা পরিচালনার জন্যই তাঁর ঢাকায় আসা। তখন কলকাতা থেকে ঢাকায় যাতায়াত করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অবশ্য তার পূর্বেই ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় পূর্ববঙ্গে রেল এবং স্টিমার সার্ভিস চালু হয়ে গেছে। তিনি কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে ঢাকা কিংবা ঢাকার নিকটবর্তী কোনো ঘাটে অবতরণ করে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন। কলকাতা থেকে মধুসূদনের ঢাকায় আগমনের মাধ্যম হিসেবে যানবাহন এবং তাঁর যাত্রাপথের বিবরণ বলতে গেলে কোনো লেখক বা গবেষক দেননি কিংবা দিতে পারেননি

বাঙালি ব্যারিস্টারই তিনি ছাড়া আরও তিনজন। সে কারণে তিনি সম্ভবত আশা করেছিলেন যে, ঢাকায় প্র্যাক্টিস করলে ব্যারিস্টার হিসেবে বিনা প্রতিযোগিতায় ব্যবসা করতে সক্ষম হবেন। বেঙ্গল ভায়রেক্টরিতে তাঁর চেম্বার লেখা হয়েছে ঢাকায়–এ থেকেও আভাস পাওয়া যায়, কবি আইন-ব্যবসা করার অভিলাষ ঘোষণা করে ঢাকায় গিয়েছিলেন

১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মধুসূদন ঢাকায় আসেন। তখন ঢাকার আরমানিটোলায় থাকতেন আর্মেনীয় জমিদার এবং ব্যবসায়ী নিকোলাস পোগোজ বা নিকি পোগোজ। তিনি ইতোমধ্যে ঢাকায় খুব প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। ১৮৪৮ সালে তিনি নিজের বাড়ির নিচতলায় নিজের নামেই প্রতিষ্ঠা করেছেন পোগোজ স্কুল। ঢাকায় প্রথম বেসরকারি স্কুল এটি। তখন নাম ছিল পোগোজ অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল। এই পোগোজ সাহেবই কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাড়িতে। কবি উঠলেন পোগোজ ভবনে। তবে নিশ্চিত না হলেও কোনো কোনো গবেষক ভিন্ন মত পোষণ করে বলতে চান যে, মধুসূদন ঢাকায় আসার আগেই পোগোজ সাহেব লোকান্তরিত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর আগেই তিনি লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। যাবার পূর্বে তিনি সম্ভবত তাঁর স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি ও জমিদারি একটি ট্রাস্ট করে দিয়েছিলেন। ১৮৮৩ সালে পোগোজের বগুড়া ও পাবনার জমিদারি নিলামে ওঠার খবরও জানা যায়। পূর্বে থেকেই অতিরিক্ত মদ্যপান এবং নানারকম অনিয়মের ফলে মধুসূদন মারাত্মকভাবেই যকৃতের সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি যখন ঢাকায় আসেন তখনো তাঁর শরীর খুব স্বাভাবিক নয়। তবু মোকদ্দমার কাজ তথা অর্থের প্রয়োজনেই তাঁর আসা। শরীরে সম্ভবত যথেষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবেই তিনি ঢাকায় এসে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মধুসূদন-গবেষক গোলাম মুরশিদ এবং খসরু পারভেজ মধুসূদনের অসুস্থতাকে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ বলেছেন। কিন্তু গৌরদাস বসাককে লেখা মধুসূদনের চিঠিতে অসুস্থতার উল্লেখ থাকলেও স্পষ্ট করে ম্যালেরিয়ার কথা বলা নেই। মধুসূদন লিখেছেন : I was nearly dead some weeks ago and had to go to Dacca where I was detained nearly 10 days and got back with much difficulty (সপ্তাহ কয়েক পূর্বে আমাকে ঢাকায় যেতে হয়েছিল এবং আমি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে ওখানে প্রায় ১০ দিন আটকে থাকতে হয়েছিল এবং অনেক কষ্টে ফিরে এসেছি)। তবে মধুসূদন যে শুধুই একটি মামলা পরিচালনা এবং মামলা থেকে উপার্জিত অর্থের জন্যই ঢাকায় এসেছিলেন এমনটি মনে করেন না মধুসূদন-জীবনীকার গোলাম মুরশিদ। তিনি লিখেছেন :

তাঁর প্রত্যাশা ছিলো আরও বড়ো। কলকাতায় অনেক ব্যারিস্টার আছেন। এমনকি বাঙালি ব্যারিস্টারই তিনি ছাড়া আরও তিনজন। সে কারণে তিনি সম্ভবত আশা করেছিলেন যে, ঢাকায় প্র্যাক্টিস করলে ব্যারিস্টার হিসেবে বিনা প্রতিযোগিতায় ব্যবসা করতে সক্ষম হবেন। বেঙ্গল ভায়রেক্টরিতে তাঁর চেম্বার লেখা হয়েছে ঢাকায়–এ থেকেও আভাস পাওয়া যায় যে, কবি আইন-ব্যবসা করার অভিলাষ ঘোষণা করে ঢাকায় গিয়েছিলেন।

কবি, মহাকবি এবং নাট্যকার হিসেবে তখন মধুসূদনের যে খ্যাতি সেই তুলনায় ব্যারিস্টার বা আইনজীবী হিসেবে তিনি মোটেই সফল, প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত নন। সে কারণে ঢাকার কোর্টে মামলার সওয়াল জবাব করতে আসার সংবাদে ঢাকার আইনজীবীদের মধ্যে কতটা চাঞ্চল্য এবং আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা মুশকিল। এই প্রসঙ্গে তেমন কোনো তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। এবং এই না পাওয়াটাই বোধ করি তাঁর নিস্প্রভতার কারণ। তবে ঢাকার কবি, সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী এবং মধুসূদনের গুণগ্রাহীরা যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। সেটা যেমন পত্র-পত্রিকার বিবরণে পাওয়া যায় তেমনি প্রিয় কবিকে সশরীরে রক্তমাংসের অবয়ব নিয়ে দেখতে পারার সুযোগ অনুরাগীদের স্বাভাবিকভাবেই উৎফুল্ল করে বলেই ধরে নেওয়া যায়। এই সময়ে ঢাকার হিন্দুসমাজে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীলদের মধ্যে নানারকম মতবিরোধ চলছিল। বিশেষত ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে রক্ষণশীলদের রাতের ঘুম টুটে গিয়েছিল। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের কারণে মধুসূদনের প্রতি এক শ্রেণির রক্ষণশীল হিন্দুর এক ধরনের অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা ছিল, ঢাকা এবং কলকাতা উভয় জায়গাতেই, যতই তিনি হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ নিয়ে কাব্য-নাটক লিখুন না কেন। এই রকম পরিস্থিতিতে ঢাকার প্রগতিশীল তরুণ কবি এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরাই মধুসূদনের সমাদর-আপ্যায়নে এগিয়ে এলেন। বিদ্যাসাগর উপাধিপ্রাপ্ত ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) এবং তাঁর অপর দুই বন্ধু হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৮-১৮৭২) এবং গোবিন্দচন্দ্র রায় মধুকবিকে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। সেই সাথে বিস্মিতও। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তখন রীতিমতো বিখ্যাত। তাঁর রচিত চিন্তামূলক প্রবন্ধ পড়ে মধুসূদন প্রশংসা করেছিলেন। অপরদিকে মধুসূদনের ভাবধারায় এবং অনুসরণে কবিতা লিখে হরিশচন্দ্র মিত্র তখন ঢাকার কবি ও পাঠকসমাজে 'নব্যমধু' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এমনকী তিনি তাঁর রচিত কবিতায় নিজেকে 'উপমা কল্পনা শ্রীমধুসূদন' বলেও উল্লেখ করেছেন। ঢাকা থেকে তখন তিনি 'মিত্র প্রকাশ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন। সেই পত্রিকায় তিনি মধুসূদনের কবিতা ও কাব্যের ছন্দ নিয়ে একাধিক বিতর্কমূলক এবং যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন।

১৮৭১ সালে ঢাকায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে কিংবা সুস্থতা-অসুস্থতার মধ্যবর্তী অবস্থা নিয়েও মধুসূদন দু-একটি সভা-সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। ঢাকা থেকে হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকা থেকে ১৮৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের এডুকেশন গেজেটে একটি নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় :

গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহু-বিবাহ নিবারণের বিষয়ে আন্দোলন হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মধুবচনে বহুবিবাহের মূল উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দত্তজ মহাশয় মন্ত্রাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায়, এই সভায় মধুসূদন হিন্দুধর্মের নানারকম সংস্কার, কুসংস্কার, প্রথা-পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেছিলেন। হিন্দুধর্মত্যাগী একজন খ্রিষ্টানের মুখে এই সব কথা শুনে সভার শ্রোতামণ্ডলী এবং শ্রোতাদের কাছ থেকে সভার বাইরের যেসকল ঢাকাবাসী কথা শুনেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই খুশি হননি তা মধুসূদন যত বড়ো কবি এবং পণ্ডিতই হোন না কেন। কলকাতার মতো ঢাকাতেও মধুসূদনের নিন্দুকের অভাব ছিল না। ঢাকার এক কবি জগবন্ধু ভদ্র মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে প্যারোডি কিংবা ব্যঙ্গ করে ইতোপূর্বে 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' নামে একটি মহাকাব্য (?) রচনার প্রয়াস (!) চালিয়েছিলেন। ঢাকার এই মহাকবি (?) তখন ঢাকায় ছিলেন কিনা বলা কঠিন। ট্র্যাজেডি হলো, জগবন্ধু ভদ্রের মহাকাব্যখানি মধুসূদনের স্বদেশি ভাই যশোরের সন্তান কলকাতানিবাসী শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকায় মধুসূদনকে যারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রমুখ মধুসূদনের সংবর্ধনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এটিকে মধুসূদনের ঢাকার নাগরিক সংবর্ধনাই বলা চলে। কেননা এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকার অধিকাংশ বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এই সংবর্ধনার আগে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পত্রিকার কার্যালয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা বসে। এই প্রস্তুতিমূলক সভাকে কোনো কোনো গবেষক মধুসূদনের একটি ঘরোয়া সংবর্ধনা বলে প্রতিপন্ন করতে চান। কেউ কেউ মধুসূদনের প্রথমবার ঢাকায় এসে তিনটি সংবর্ধনা লাভের খবর পরিবেশন করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার কার্যালয়ে সংবর্ধনা তিনটির মধ্যে একটি।

ঢাকার নাগরিক সংবর্ধনার অভিনন্দনপত্রটি খসড়া করেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ঢাকার বিখ্যাত পোগোজ স্কুলে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকায় এসে মধুসূদন দত্ত পোগোজ সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন বলে পোগোজ স্কুলে এই নাগরিক সভার আয়োজন করার ভূমিকা ছিল বলেও মনে করা হয়। ঢাকাবাসীর শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভালোবাসায় মুগ্ধ এবং আপ্লুত মধুসূদন এই নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরে একটি সনেট পাঠ করেছিলেন। সনেটটি তিনি কখন রচনা করেছিলেন, সংবর্ধনার বার্তা শোনার পর এবং সংবর্ধনা লাভের পূর্বে নাকি সভা চলাকালীন, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মধুসূদনের রচিত এবং পঠিত সনেটটি নিম্নরূপ:

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ণ হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি।

ঢাকাবাসীর সংবর্ধনার জবাবে মধুসূদনের পঠিত সনেটের বক্তব্য থেকেও অনুমান করা যায় যে, তিনি কেবল একটি মামলা পরিচালনার জন্য ঢাকায় আসেননি। রোগে আক্রান্ত এবং ঋণে জর্জরিত মধুসূদন ঢাকার কাছে, ঢাকাবাসীদের কাছে কিছু সাহায্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিলেন। সনেটেই তিনি বলেছেন, ঢাকার 'প্রতি বাঁধা লক্ষ্মী' এবং দেবী সরস্বতী 'নিত্য অতিথিনী।' সারা-জীবন ধরেই তিনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতী–এই দুই দেবীর আরাধনা করেছিলেন। সরস্বতী ধরা দিলেও লক্ষ্মী যেন অধরাই রয়ে গেলেন। ঢাকায় যেন এই দুই দেবীরই সহাবস্থান। ঢাকা যদি দেবলোক নাও হয়, বেদ পুরাণে যদি ঢাকার নাম উল্লেখ নাও থাকে, তবু ঢাকা-ই তাঁর কাছে আদর্শ জায়গা। তাঁর আশা এবং বিশ্বাস, ঢাকাই তাঁর ভাগ্য খুলে দিতে পারে। তাঁকে সব রকম পীড়ণ ও দহন থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

এই সনেটে কবি একদিকে নিজের অতি শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে প্রত্যাশা করেছেন নতুন জীবন শুরু করার। তিনি নিজের দুরবস্থা বোঝানোর জন্যে এতে দুটি ট্র্যাজিক উপমা দিয়েছেন। একাটি হিমালয়-পুত্র মৈনাক গিরির সাগরে আত্মগোপন করার। অন্যটি যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে পলায়নের মর্মস্পর্শী কাহিনির। অহঙ্কারী মৈনাক গিরি দৈবশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে কাপুরুষের মতো সাগরে লুকোতে বাধ্য হয়। আর নিজে মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধন জীবন বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে একাকী আত্মগোপন করেছিলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারেননি। যুধিষ্ঠিরের কথায় উত্তেজিত হয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন সেই হ্রদ থেক। তারপর গদাযুদ্ধে ভগ্নোরু হয়ে প্রাণত্যাগ করেন তিনি। মৈনাক গিরি এবং দুর্যোধন-উভয়ের ক্ষেত্রেই অহঙ্কার এবং দর্পের শোচনীয় অপমান এবং পরাজয় লক্ষ্য করা যায়। কবিও তাঁর সীমাহীন অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে রাজধানী কলকাতার আড়ম্বরের বদলে আগ্রহভরে মফস্বল শহর ঢাকার আতিথ্য নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সকল উচ্চাশা জলাঞ্জলি দিয়ে কবি ঢাকার কাছে নিজের প্রার্থনা জানিয়েছেন : করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতি।

ঢাকাকে এত ভালোলাগার, ভালোবাসার এবং ঢাকার মানুষের কাছ থেকে এত সম্মান সমাদরের পরেও মধুসূদন কেন ঢাকায় বসবাস বা আইন ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিলেন না সেটা অবশ্যই ভাববার বিষয়। গবেষকরাও এই প্রশ্নের বিশেষ কোনো সদুত্তর দেন না। তবে ধারণা করা যেতে পারে যে বহুদর্শী মধুসূদন সারাজীবন আবেগ এবং অস্থিরতা দ্বারা তাড়িত হলেও এই পর্বে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঢাকায় সাহিত্যিক এবং পাঠকদের কাছে তাঁর যে সম্মান এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে, আদালতে তা হয়নি। যদিও ঢাকার আদালতে মধুসূদনের অভিজ্ঞতার কথা কোনো গবেষকই লেখেননি। তাছাড়া যকৃতের অসুখে ভুগতে থাকা মধুসূদনের তখন যা শারীরিক অবস্থা, উপরন্তু ঢাকায় এসে মারাত্মক অসুস্থ হবার ভীতি তাঁকে পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকার সাহস, শক্তি ও নির্ভরতা দিতে পারেনি। সে কারণে তাঁর চোখে স্বপ্ন এবং অন্তরে আশা জাগলেও ঢাকায় অবস্থান করাটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেবারে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলেও মধুসূদনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মধুসূদন দ্বিতীয়বার ঢাকায় আসেন মাস কয়েক পরে ১৯৭২ সালে। তখন ফেব্রুয়ারি মাস। ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় ঢাকায় মধুসূদনের সংবর্ধনার খবর প্রকাশিত হয়। খবরে লেখা হয়:

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতাকালীন বলেন যে "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি, এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যেমনি বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।

মধুসূদনের ঢাকায় আসা নিয়ে মধুসূদন-জীবনীকার ও গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে, মধুসূদন ১৯৭১ সালে ঢাকায় আসেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের মতে, মধুসূদন ১৯৭২ সালে ঢাকায় আসেন। নগেন্দ্রনাথ সোম জানান, মধুসূদন ১৮৭২ সালে দ্বিতীয়বার ঢাকায় আসেন। মধুসূদনের প্রথম জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে, মধুসূদন ১৮৭৩ সালে ঢাকায় আসেন। আবার সুরেশচন্দ্র মৈত্র একথাও বলেন যে, মধুসূদন একবারই ঢাকায় আসেন। তবে মধুসূদন দ্বিতীয়বার কেন ঢাকায় এসেছিলেন সে বিষয়ে কেউই কোনো কারণ নির্দেশ করতে পারেননি। নগেন্দ্রনাথ সোম আবার এমনটিও দাবি করেন যে, ঢাকাকে উদ্দেশ্য করে মধুসূদন যে সনেটটি রচনা করেন সেটি দ্বিতীয়বারে ঢাকা সফরের সময়ে রচিত। এই বক্তব্যের যেমন যুক্তিসঙ্গত সমর্থন পাওয়া যায় না তেমনি সনেটটির বিষয় বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে এটি তাঁর প্রথমবার ঢাকা সফরকালে রচিত বলেই প্রতীয়মান হয়। জীবনীকার ও গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মধুসূদন দুইবারই ঢাকায় এসেছিলেন। •

তথ্যসূত্র :

১. মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৮

২. নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি', কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৩৯৮

৩. গোলাম মুরশিদ, 'আশার ছলনে ভুলি', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩২০

৪. খসরু পারভেজ, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৬৪

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মধুসূদন দত্ত', 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা- ২৩', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৯০

৬. মধুসূদন দত্ত, 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৬০৩

৭. গোলাম মুরশিদ, পৃ. ৩২০

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯১

বিভূতিভূষণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
শহীদ আবুল কাশেম কলেজ

অলংকরণ : মিজান স্বপন

বটবাবা

ফণীশ্বরনাথ রেণু

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : সফিকুন্নবী সামাদী

অনূদিত গল্প

[ফণীশ্বরনাথ রেণু (১৯২১-১৯৭৭) মুন্সী প্রেমচন্দের পর হিন্দি কথাসাহিত্যের সবচাইতে প্রভাবশালী লেখক। সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের কারণে বঙ্গদেশে তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সতীনাথ ভাদুড়ীর ভাবশিষ্যও বলে থাকেন। 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের কারণে তার পরিচিতি বাড়লেও তিনি কিছু অসাধারণ ছোটগল্প লিখেছেন, লিখেছেন স্মৃতিকথা এবং রিপোর্টাজ। গ্রামীণ ভারতের, বিশেষত বিহার অঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষের জীবন এবং দারিদ্র্য-বঞ্চনাকে তুলে ধরবার জন্য তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন সাহিত্যিক সমাজে। ভাষাভঙ্গি এবং শব্দ ব্যবহারেও গ্রামীণ বিহারকে উপস্থাপন করেছেন তিনি তাঁর রচনায়।]

গ্রামের লাগোয়া সড়কের ধারের সেই পুরোনো বট-বৃক্ষ।

এবার পাতা ঝরার মৌসুমে ওর পাতা যখন সব ঝরে পড়ে, লাল-লাল কচি কোমল পাতা দূরে থাক, পাতার অঙ্কুরও গজায়নি। ধীরে ধীরে ও শুকোতে থাকে আর একদম শুকিয়ে যায়, দ্রুতই শুকিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা নিরধন সাহুর দোকানে এই বৃক্ষ নিয়েই আলোচনা চলছিল। যখন থেকে এই গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক মোড়ল অনন্ত মণ্ডলের দুনিয়া বিগড়ে গেছে, তাঁর বৈঠকখানা উজাড় হয়ে গেছে, তখন থেকে সন্ধ্যাবেলা গ্রামের লোকজনের মণ্ডলী বসে নিরধন সাহুর দোকানেই। সারা দিনের ক্লান্ত-শ্রান্ত কৃষক, খেতমজুর নুন-তেল, চাল-ডাল নিতে অথবা এমনিতেই কিছুক্ষণ বসে তামাক খেতে খেতে সুখ-দুঃখের কাহিনি বলতে-শুনতে চলে আসে। সন্ধ্যাবেলা কিছুক্ষণ বসে কথা বলবার এই একমাত্র আশ্রয়। হ্যাঁ তো, সেদিন সন্ধ্যায় ওখানে ওই বৃক্ষের ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছিল। আট-দশ জন লোক বসে ছিল। ফরজন মিয়াঁ বলে, 'আরে! কী জিগায়, আমার দাদা কইত, তার বাপের ছোটবেলায়ও এই গাছ এমনি বুড়া আছিল।...ওহ!'

বসে থাকা লোকেদের সকলেই এরকম কিছু না কিছু বলে। বুড়ো নিরধন সাহুর শরীর কালাজ্বরে কঙ্কালসার হয়ে গেছে, তার ওপর কাশি, কিছু বলতে নিলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করতে শুরু করে। তার আঠারো বছরের মেয়ে

লছমনিয়া দোকান চালায়, বুড়ি উশুল-তাগাদা করে আর শহর থেকে মাথায় করে সওদাপাতি নিয়ে আসে। বুড়ো বসে বসে দিন গুনছে। এখন যেই সে বৃক্ষের শুকিয়ে যাবার কথা শোনে, কাশতে কাশতে কঁকাতে কঁকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বলে, 'বটবাবা শুকাইয়া যাইতাছেনি?'

বসে থাকা মণ্ডলী একস্বরে বলে, 'হ!'

'অহন আর দুনিয়া থাকব না'–বলে এই যে সে কাশতে শুরু করে, বিশ মিনিট পর্যন্ত কাশতেই থাকে। কাশি শান্ত হলে পরে ধরে আসা স্বরে লম্বা শ্বাস নিয়ে বলে, 'অহন আর বাঁচমু না, হায় রাম!'

হিমালয় এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ছিল ওই বৃদ্ধ বটবৃক্ষ এবং গ্রামের। ওই উন্নত মস্তক বিশাল বৃক্ষ প্রতিদিন ভোরে ফিকে অন্ধকারে গ্রামের আঙিনায়-আঙিনায় দৃষ্টি চালিয়ে, পূর্বদিগন্তে নাজানি কী দেখে একবার শিহরিত হয়ে... ফুঁপিয়ে কেঁদে, তারপর টপটপ অশ্রু বইয়ে শান্ত হয়ে যায়। ঘুমন্ত গ্রাম যখন আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে তখন তার জটারা হেলতে-দুলতে থাকে। বৃক্ষে পক্ষীদের কলরব চলতে থাকে।

শীতের দিন হোক কিংবা গরমের মৌসুম, কিংবা হোক না বর্ষার লাগাতার বর্ষণ, সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি ওর নিচে নারী-বৃদ্ধ-শিশু-জোয়ান, গাই-মহিষ-বলদের ছোটখাটো দল বসেই থাকে। চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে তো পুরো গ্রামই ওর শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। গ্রামের কর্মকার এখানে বসেই হাল, কাস্তে ইত্যাদি মেরামত করে, ঘর বানানো মজুর এখানে বসেই বাঁশ চেরাই করে, চাঁছে। মেয়েদের ছেঁচা-ঘুঁটা চলতে থাকে, বাচ্চাদের ঘরোয়া খেলা, জটা বেঁধে দোলনা দোলা, বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতা-গরিমা-মিশ্রিত কথা এবং নবযুবকদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে নববধূ এবং ভাবিদের ঠাট্টা-তামাশাও চলতে থাকে। বৃক্ষতলের একদিকে মাটি খোদাই করা কালো চুলো, তার পাশে জ্বলা-আধজ্বলা কাঠ সর্বদা ছড়িয়ে থাকে। রাতে বেপারী এবং গাড়োয়ানদের এটাই 'রাত্রিনিবাস।' এছাড়াও কখনো বরযাত্রী তো কখনো বধূর ডুলি, কখনো গায়েন-বায়েন, হাতি-ঘোড়া কিছুক্ষণ এখানে বসেই বিশ্রাম নেয়, গ্রামবাসীর মনোরঞ্জন করে চলে যায়। বধূর ডুলি দাঁড়ায়, কিশোরী-বালিকা, বালক-বৃদ্ধ 'লাল ডুলি, লাল ডুলি, লাল কনে!' বলতে বলতে দৌড়ায়, ডুলির জানালা খোলে, সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখে।

কিশোরী মেয়েরা মনে মনেই আকাঙ্ক্ষা সাজায়, সাহসী ছোট ছোট বালক দৌড়ে এসে মাকে বলে, 'আমিও এমনি বউ নেব।'

এক জমানা ছিল, যখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওর নিচে দেওয়ালির বাহার থাকত। প্রত্যেক বাড়ি থেকে ঘিয়ে ভরা একেকটি প্রদীপ যেত। সমস্ত রাত ঝলমল-ঝলমল...!! কিন্তু এখন কয়েক বছর থেকে কেবল বেণেবউয়ের প্রদীপই কিছুক্ষণ টিমটিম করে নিভে যায়, জোনাকির আলো সমস্ত রাত ধরে থাকে।

একাদশী, পূর্ণিমা ইত্যাদি এবং নানা পর্বে ওর পূজাও হয় সিঁদুর-চন্দন, অক্ষত, ধূপ-দীপ, পান-সুপারি দিয়ে। ও 'দেবতা' ছিল হিন্দুদেরও, মুসলমানদেরও। এই কয়েক বছর ধরে মুসলমানেরা পূজা-পত্র ছেড়ে দিয়েছে। এক মৌলভী সাহেব এসেছেন, তাঁর কথায়। কিন্তু 'বটবাবা' ছেড়ে অন্য কোনো নামে সম্বোধন করবার সাহস এখনো তাদের হয়নি। বটবাবা কত মানতকারীর আকাঙ্ক্ষা-মিনতি শুনে এসেছে। যে তার কাছে নিরাশ হয়েছে, চিরতরে নিরাশ হয়েছে। যার মনোকামনা পূর্ণ হয়, সে সফল-মনোরথ হয়ে যায়।

কালকের বালিকা যুবতী হয়, বট-সাবিত্রীকে পুজো করতে আসে, কিছুদিনের মধ্যে তার ছেলেরও ছঠি পুজো হয়, মুণ্ডন-উৎসব হয়, তারপর বিয়েতে যখন সে নানান অলংকার পরে প্রণাম করতে আসে, তখন ওর জটা সবসময়ের মতো দুলতে থাকে। পুতুলের মতো বধূ আসে সোনা-রুপার অলঙ্কারে ঝমঝম করতে করতে, গায়ন-বাদনরত নারীগণ তাকে নিয়ে আসে, প্রণাম করিয়ে নিয়ে যায়। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাজানি কত বছর ধরে দেখে আসছিল বরযাত্রা, শবযাত্রা, ভরা লাল সিঁথি, ধোয়া রংহীন সিঁথি, ফুলের মতো কোমল শিশুর মায়ের কোলে সহাস্যস্বর আর চিরনিদ্রায় মগ্ন। একই দিন, গ্রামে দশ-দশ শিশুর মাঙ্গলিক গীত গাওয়া এবং একসাথেই পনেরো-পনেরো শবাধার ইত্যাদি দেখতে দেখতে ও স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল।

এবার সে দ্রুত শুকিয়ে গিয়েছে। প্রতিবছরের মতো বৈশাখের দুপুর আসে। উত্তপ্ত রোদে অগ্নিবর্ষণ হতে শুরু করে আর এবার গ্রামের পশু-পক্ষীদের মাঝেও আর্তনাদ শুরু হয়ে যায়। আসা-যাওয়া পথিক, গাড়োয়ান এক নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু বলতে বলতে চলে যায়।

গ্রামের বাইরে সড়কের ধারে অজ্ঞাত কাল থেকে দাঁড়িয়ে ছিল ও। এমন মনে হয় যেন ভয়ে হার্টফেল করে মারা যাওয়া ভয়ানক রাক্ষসের কঙ্কালকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ এবং চোখ ভয়ে বিস্ফারিত, দুহাত তুলে রাখা কঙ্কালের মতো।

ও শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ওর প্রতি গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা-ভক্তির ধারা আরও তীব্র হয়ে গেছে। এমনিতে তো আপদে বিপদে ওর প্রতি আবেদন নিবেদন এবং পূজা আগেও হতো, কিন্তু যখন থেকে বৃক্ষ ধীরে ধীরে শুকোতে শুরু করেছে পূজা এবং আবেদন-নিবেদনের যেন ধারা শুরু হয়ে গেছে। লোকেদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে বাবা যাবার সময় সকলের মনোকামনা পূর্ণ করবে। যার প্রতি সদয় হবে, সে ধনসমৃদ্ধ হবে। এই তো সেদিন অনন্ত মণ্ডলের পুত্রবধূ চার আনার বাতাসা মানত করে এসেছে, তার স্বামী ভারতরক্ষা আইনের অধীনে আড়াই বছর জেলে নজরবন্দি আছে এবং ক্ষয় রোগের শিকার হয়ে গেছে, সে যেন ছাড়া পায়। রোগও যেন ছেড়ে যায় সেও যেন ছাড়া পায়। যেদিন প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি এসেছিল, বেনারসি শাড়ি, গহনা আর শিক্ষিত স্বামীর অহঙ্কারে সে বলেছিল, 'আমি গাছ-পাথরের পূজা করি না।' লোকে বলে আর সেও মানতে শুরু করেছে যে তার এই দুর্দিন ওই অহঙ্কারের কুফল। সেদিন সে যে গিয়েছিল, শরীরে ছিল স্রেফ একটা ছেঁড়া শাড়ি, যাতে লেগে ছিল পাঁচ-সাত তালি, চার-পাঁচ শাড়ির টুকরোর তালি লেগে ছিল, দুই-আড়াই হাত কন্ট্রোলের শাড়ি, বাসররাতের শাড়ির এক টুকরো এবং অন্যান্য শাড়ির টুকরোর তালি দিয়ে বানানো এক পাঁচরঙা শাড়িতে লজ্জা ঢেকে, অশ্রু মুছতে মুছতে সে বলেছিল, 'বাবা! এখন এর চেয়ে বড় আর কী শাস্তি দেবে!' আর সে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

নিরধন সাহুর মেয়ে লছমনিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলে এসেছে, 'বাবা! গ্রাম-মহল্লা, পাড়া-প্রতিবেশী আর জাতের লোক সবাই হাসতে আছে। আমি এত বড় হইয়া গেছি, কোনো ছেলের বাপ এক হাজারের নিচে তিলকের কথা পর্যন্ত কয় না। আমার বাপ আর ঘরের দশা তোমার অজানা নাই। দুনিয়ার জন্য তুমি শুকাইয়া গেছ, কিন্তু তোমার প্রতাপ তো শুকায় নাই। বাবা! যদি কোনো ছেলের বাপের মন ফিরাইয়া দেও তো আমি আট আনার মিঠাই, সোয়া হাত নেংটি আর প্রত্যেক রবিবার নতুন বাত্তি জ্বালাইয়া দিব।'

কলরূ মহাজনের ওপর জমিদারের ক্রোক আসন্ন ছিল। টহলূ পাসওয়ানের ছেলে ফৌজে ছিল, ভজূ ধানুকের স্ত্রী অসুস্থ ছিল। সকলে নিজের-নিজের জান-মালের জন্য মানত করে এসেছে।

আজ সকালবেলায়ই জমিদারের আমলা-সিপাহী চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মজুর নিয়ে আসে, গ্রামের মজুরদেরও বেগার খাটার জন্য ধরা হয়। যুদ্ধের সময়, জ্বালানি কাঠের খুব অভাব। জমিদারবাবুর হুকুম, এই বৃক্ষ কাটা হবে। লোকজন নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতে শুরু করে। একই সাথে বৃক্ষের শুকনো কাণ্ডে ষাট-ষাটটি কুঠারের আঘাত পড়ে–'ধর-ধর খড়-খড়-খড়াক...' গরু-মহিষ, ঘোড়া-ছাগল চমকে উঠে গ্রাম থেকে পালায়, কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে, ভয়ার্ত পাখিরা কলরব করতে আরম্ভ করে। ছোট বাচ্চারা ভয় পেয়ে মায়ের বুকের সঙ্গে লেপটে যায়। গ্রামের অর্ধনগ্ন নরনারী এবং শিশুদের কঙ্কালের কাতার... এক দৃষ্টিতে দেখছে। কোনো কোনো পুরুষও ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, যেন সকলের কলিজাতেই কুঠার চালানো হচ্ছে।

...ধড়-ধড়-ধড়-ধড়াম... আর্তনাদ করে বৃক্ষ পড়ে যায়, তারপর গ্রামে ভারী কোলাহল...!!

নিরধন সাহু কাল থেকে বেহুঁশ। বলার এবং শোনার শক্তি সম্ভবত চলে যাচ্ছে। অন্তিম মুহূর্ত গুনছে। বৃক্ষ পড়বার বিকট আওয়াজে সেও চমকে ওঠে, অস্ফুট স্বরে বলে, 'আসমান থেইকা... কী পড়ল রে লছমনি...! আরে বাপ!!'

লছমনিয়া জানালা দিয়ে দেখছিল আর দ্রুতশ্বাসে ফোঁপাচ্ছিল। •

সফিকুন্নবী সামাদী
অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুনীল শর্মাচার্য

তারপর চলে যাও

তিসির খেত তোলপাড় ক'রে বাতাস শিস দিলে
ভয়ে নীল ঘনকালো হিজলপুকুর হ'য়ে যাও–

দ্রাবিড় দেবতাজ্ঞানে হোম, মধুপর্ক আর
বিষের বাটা হাতে উঠে আসো অপেক্ষার অন্নসুখে–

দূর থেকে চন্দ্রালির ক্ষুধা দেখে–এক, দুই, তিন করে
গুনে যাও, আর পাঁচটি আঙুলে পরে নাও পাঁচটি গ্রহের ধাতু
যাতে জলে ও আগুনে কোনো ভয় না থাকে–

তারপর চলে যাও পথে কিংবা মাঠে শস্যের সন্ধানে–

তুষার দাশ

সঞ্চয়

তোমাকে হারিয়ে দেবে রাজনীতি,
মানুষের বিন্যস্ত কাঙালপনা, নতমুখ, হতবিহ্বলতা।
তোমাকে টানবে ধরে পায়ে পায়ে লোভ, ঈর্ষা,
পূর্ব প্রবঞ্চনা, আর ধর্মভীরু চোরাটান, অন্ধকার–

খালি পায়ে বরফবিছানো পথে যারা হেঁটেছিল সাথে,
তারা দূরে সরে গেলে,
শূন্যটুকু দখল করবে যারা,
সেসব মুখেরা থাকবে একান্ত আড়ালে–

তারাই হারিয়ে দেবে অস্ত্রযুদ্ধে,
বিনা অস্ত্রে ভেঙে দেবে অনুদ্দীপিত বল্মীক এক নিম্নতর স্বৈরাচারে,
ভেতরে লতিয়ে ওঠা স্বপ্নঋদ্ধ মর্মমূলে যাওয়ার বাসনা-স্বপ্ন,
ঋদ্ধ রৌদ্রদিনের আকুল সৃজনাকাঙ্ক্ষা, বসন্তবাহার।

রবীন্দ্র নাথ অধিকারী

যদি না হয় দেখা

তোমার চাতুর্য আমাকে দিয়েছে মহিমা
দিয়েছে যৌবনোত্তর দেহ অবয়ব
পিয়ানো রহস্যের মতো সে যে কি অভিমান

আমি তা ভুলিনি
খুলিনি তোমার খোঁপার ফুল
যদি হয় ভুল
যদি না হয় দেখা
বেদনাবিলাসী আকাশে একাকী
যদি না হয় আঁকা ছবি
মনে রেখো আমিও ছিলাম
তোমার হৃদয়ের গভীরে গহিনে
শোকাতুর এক কবি, বিশীর্ণ ইন্দ্রজালে।

রিঙকু অনিমিখ

আলোর বর্জ্যে মুদ্রিত সন্ধ্যা

আমরা তো এইখানে বসে থাকি
এই ন্যালাক্ষ্যাপা সূর্যের উদ্ভট ছায়ার নিচে
তুমি থাক কোথায়? কোন সূর্যালোকে?

তোমাদের বিনাশী চিমনির আলোয়
পুড়ে যাচ্ছে আমাদের সবুজ আকাশ
হিমশীতল চাঁদ খুঁটে নিচ্ছে খুদ ও ক্ষুধা
যেন-বা জীবের ভেতর জীব হয়ে থাকা
কৃমির নাশকতা;
প্রতিবেশী ছদ্মবেশে ঘিরে আসছে অন্য পৃথিবী

আমরা তো ন্যালাক্ষ্যাপা সূর্যের উদ্ভট ছায়ার নিচে
এখানে–আলোর বর্জ্যে মুদ্রিত সন্ধ্যা

প্রীতি আচার্য

অন্যমনস্কতা

শূন্য হয়ে আছি। অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে বিকল হয়ে পড়ে থাকা টিউকলের নলটির মতো ফাঁকা লাগছে। বর্ষার আকাশে ধাবমান মেঘেদের মতোই: মগজের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সবকিছু। এতটুকু ছাপ নেই কোথাও কোনো রকম প্রাত্যহিকতার! কিছুই ধরা পড়ছে না। কচুপাতার জলের মতো টলমলে সবকিছু। অজান্তে কি গারবেজের বাক্সে পড়ে গেল খুলি থেকে মগজটা? নির্ঘাত তুলে দিয়েছি কোনো এক হাউজ স্কিপারের হাতে।

স্নেহাংশু বিকাশ দাস

কী যত্নে লিখেছ কুয়াশা

নির্জন সাদা পাতা, কী যত্নে লিখেছ কুয়াশা
প্রিয় পাহাড়ের পথ, বিস্তার
ছুঁতে চেয়েছ অলৌকিক পাঁজর
পুরনো কেল্লা থেকে চুঁইয়ে পড়ে কলরব
রাত কত হলো, জানে না মাটির বেহালা
পাপ নাও, পুণ্য নাও, নাও পীতবর্ণ ধুলো
হাজার বছর ধরে মৃত তারাদের ছাই ঝরে
মনে হয় কাছাকাছি–দূরে অর্ধসত্য শব্দরা
অন্ধকার সারিয়ে ঘর বাঁধছে খড়কুটো মুখে
হে সময়, অর্থহীন আয়ু, এই সাদা পাতায়
পড়েছে ভেতরের আলো, অভিমান লেখা হয়

গৌতম মণ্ডল

মানুষ

উৎসব নেই, অশ্রু আছে

অশ্রুর অন্ধকার থেকে
উঠে আসে মানুষ

কালো রাত্রির মানুষ

তারা বেঁকে যাওয়া
নদীর দুধারে দাঁড়ায়
বসে
তারপর নক্ষত্রের মতো
জ্বলে ওঠে

নিভে যায়

অনুপ মণ্ডল

ইহজন্মের পালক

বরফকলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় নির্ধারিত গতিপথ
পরিবর্তন করল হাওয়া, আর অমনি
অধিকারবোধে ঘা লাগতে শুরু করল আমার

প্রসারিত ডানার শিয়রে বসে আছেন শিকারি ঈগল
ডানার তলায় তলায় ভুসোকালি
অম্লশূলে ভুগতে থাকা অর্ধেক আকাশ আমার
আমার উৎসন্নে যাওয়া কালি কলম ও সন্তানাদি
আমার ইহজন্মের পালক। আবারো বলছি
হাতখানা সরাও, আমার অধিকারবোধে ঘা লাগছে

হাঁসের গতিবিধি লক্ষ করে
পুরোনো লণ্ঠনের সঙ্গে পুরোনো প্রতিবিম্বগুলোকেও
এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে
বরাবরের জন্য গুন টেনে নিয়ে গেছি আমি
কতকাল আর কতকাল
ভেঙে গেছে ব্রীড়াবনত ঢেউ, ঘূর্ণিতে ব্যাকুল জ্যোৎস্না
ঘোলা জলের বন্দিশ

গোলুইয়ের মুখে উবু হয়ে বসে আছে বুকে পাথরবাঁধা একখানি ভোর

সাদাত হোসাইন

জীবন পাঠের নতুন অভিধান

এই যে সময় চলে যাচ্ছে–
সে মূলত ধূসর করে দিয়ে যাচ্ছে দুঃখ।
মুছে দিচ্ছে দহন দিনের গান, সময় জানে লিখতে
তোমার জীবনপাঠের নতুন অভিধান।
এই যে তুমি কাঁদছ ভীষণ, বাঁধছ বুকে কারও জন্য স্মৃতির মিনার।
এই যে তোমার চোখের কিনার থইথই জলে, তার কতটা তোমার কথা বলে?
এই যে তুমি পথ হাঁটছ, হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খাচ্ছ পথের ধুলোয়।
ভাবছ বসে কোথাও কেউ নেই। বুকের ভেতর জ্বলছে যেজন আলোর মতন,
হারিয়ে গেল হঠাৎ সেও নিজের অজান্তেই।
ওই আসছে ঝড়, অন্ধকারের ভেতর থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছে গ্রীবা, অতীত অতঃপর।
ভেঙে দিচ্ছে বাঁধ, ধসিয়ে দিচ্ছে পায়ের তলার মাটি, তবুও চলো সময়, শুধুই
তোমায় সঙ্গী করে হাঁটি।
সময় জানে, মিটিয়ে দিতে দে না।
আয়না মেলে চোখের সামনে কে কতটুক চেনা!
কে কতটুকু সত্যি ছিল, কার কতটুক ভান–
এই হিসেবের সব মিটিয়ে সময়
লিখবে তোমার নতুন দিনের গান,
লিখবে তোমার জীবন পাঠের নতুন অভিধান।

হাদিউল ইসলাম

প্রহসন

পাতা পড়ে আছে প্রখর ফাল্গুনে
তুমি হেঁটে যাচ্ছ, পাতা ভাঙছে পায়ের তলায়
মচমচ শব্দে জেগে উঠছে আমার জীবন

বিপুল মুগ্ধতা পায়ের সৌন্দর্যে স্থির
পথের কিনারে এক প্রহসন তবু–
মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে হালকা জ্বরগ্রস্ত গ্রামে

হায় বৃষ্টি, আমাকে ভিজিয়ে দাও
বাংলাদেশ সবুজ না হলে কি মানায়?

সিদ্ধার্থ অভিজিৎ

কুয়াশার মরশুম

শিকারি বেড়ালের মতো এগিয়ে আসছে শীত–
শীতের বোধন অকালবোধন পেরলো;
দু-তিনটি আদুরে সোয়েটার
মন-ফাগুনের-মরশুম ফিল করে শিহরিত।
মাঠজুড়ে হরিৎ ধানের-প্যান্ডেল;
ধীরে সুস্থে বিসর্জনের বাদ্যি পোক্ত আসন গাড়ছে–
গাড়োয়ান এবং দু-তিনটি হরিতকি ফলে
সংকল্প মন্ত্র আসে–আসে বা না আসে
আমাদের সংকল্প দৃঢ়; শীতের ফ্লেবার নিতে
আমরা রিক্ততা পুষছি

কৈজাশ কোয়েঝা

দূরাগত কফিন

ধোঁয়ার কবাট খুললে বেরিয়ে আসে রেশমি পাখির ডাক
শোনা যায় সমুদ্রপথের শঠকারিতা–
হবিলেস নিকোটিন দরজা আটকিয়ে দিলে আমরা টেবিলে বসি
গল্প জমাই নিঃস্ব বর্তমানের
কখনো টেবিল বাজাই শ্বাসের পাউডার মেখে
তাল কাটলে মন্থনের গোধূলি স্নানের জলশূন্যতা মনে পড়ে–
তবু বসে থাকি মিসলটো জগের হাতলে মাথা রেখে
শুনি জলাতঙ্ক পরিদের বাসনার পরিপক্বতা।

তৌফিক জহুর

ত্রিবেণির ঘাট

ইড়া ও পিঙ্গলাকে অগ্রাহ্য করে
সুষুম্না পথে হেঁটে যাই
যে পথে মিলন পরমাত্মার ডাকে জীবাত্মার

আগুনের তেজ কমিয়ে দুধ জ্বালে ক্ষীর
অমাবস্যা রাতে চন্দ্রোদয়ে
চোখে নেশা কলসভরা জল

ভাটির স্রোতধারায় গাঙের ঢেউ
শুক্লপক্ষে চন্দ্রোদয়ের সাধনা সপ্তদিবসে
ইড়ার উজানস্রোতে সাঁতার কাটে মাছ

অমৃতের সাধনায় মজি দেহবৃক্ষে জলজবীজ

আজিজ কাজল

গন্ধ পর ঝোপ

তোমার খনিজ পাতার আম-গন্ধে পাগল হয়ে ওঠি, সুঁই-হরিণী চোখ থেকে ঝরে পড়ে রাগ
নৌকা দিনের বাদল-ছুট কী-ফরসা আর স্বর্ণময় হয়ে আছে! ঝিলের পাখনায় নাচে মন-বাও মৎস্য ঘাট

কড়ি-বাকলের দিনগুলোতে, শাকপাতা দিয়ে পাকাতাম দেহঘড়ি; জোছনা জোছনা পাখা মেলে
মন আনন্দে খেতাম কৈ-করলার স্বাস্থ্যকর স্যুপ
এখন জল-ঝুপ থেকে উঠে যাওয়া সমস্ত বকগুলো যন্ত্রমূক–কথা বলে স্যাটেলাইট ভাষা-চরিত্রে;
আমার মন-চুনিয়া আরও বেশি আন্ধা হয়ে যায়; শক্তিশালী স্মৃতিগুলা উঝাট খায়, ফেটে ফেটে যায় এক নিমিষে।

অনু ইসলাম

অহমিকা ভেঙে এসো

অহমিকা ভেঙে এসো–মাটিমুখী হই কিংবা আকাশচিত্রে জ্যোৎস্না দেখি।
দেখো–মাটিতে আশ্চর্য বিনয়ফুল ফুটে আছে।
এসো, সপ্রতিভ হয়ে তুলে আনি জীবনের সুঘ্রাণ!

আকাশচিত্রে বিপুলা পৃথিবীর রঙিন উদারতা; এসো রং খুঁজি
এসো, সহজিয়া হয়ে উঠি বোধে ও সৃজনে।

জ্যোৎস্নারেণু–আবহমান তারুণ্যকণ্ঠ
এসো, নিবেদিত হই জ্যোৎস্নার গানে; জোনাকের উড়াউড়ি আঁকি।
জ্যোৎস্না; সে তো চিরকাল প্রেরণাস্বরূপ প্রণয়ের!

অহমিকার দেয়াল ডিঙিয়ে এসো–
এসো, ক্রমশ আলোড়িত করি নির্মল একটা জীবনদীপ।

আদ্যনাথ ঘোষ

প্রণয়ের প্রজননে

রাত্রি গভীর হলেই পৃথিবীর ঘুম পেয়ে বসে।
কথা বলে আঁধারের চাঁদ। স্বপ্নেরা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে
ঢুকে পড়ে বেহুলার অন্তর জ্বালায়। আর
পৃথিবীর ঘুম শেষ হলে; আঁধারও কেটে পড়ে
দ্রৌপদীর ঘুমহারা চোখে, রাধার বিষণ্ন হৃদয় কোনায়।
মেঘেরাও ছাউনি টানায় মথুরার সিংহাসনে,
দেবকীর পরাণ চিতায়। এতসব ঘোর কেটে গেলে,
অপেক্ষারা জলসায় মাতে, প্রণয়ের প্রজনন নিয়ে
বারোয়ারি কৃষ্ণের বিচিত্র সংসারের নিয়তি খেলায়।

কাওকাবা হীরা

দৃশ্যচিত্র

একলা আকাশের ছাদ থাকে না,
একটা ইজিচেয়ার, একটা চৌকাঠ, দু-চারটে ছাতিম ফুল,
আর ভিড়ঠেলা মৌমাছি।

সবই বেওয়ারিশ!

পুতুল-ঘরের বেমানান কথা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ায়,
একটা বেব্রিফ্রক, একটা ক্যান্ডি, একজোড়া শ্যু-জুতা,
কবেকার লাল ক্লিপ–
একই হাপিত্যেশ!

অসময়ে নীল-কাক কালো রং হয়,
একটা ভাঙা ডানা, একটা ফটোফ্রেম, পুরনো পিচ গলি,
অবিকল চেনা মুখ–
কথা সবিশেষ!

রনক জামান

তক্ষকবর্ণ

একটি পেয়ারাগাছ দ্বিবীজপত্রী ও একটি তক্ষক সঞ্চরণশীল; মিশে যেতে যেতে আপাতত পেয়ারাগাছের কাণ্ড!

একটা ভাষা শুধু পর্ণমোচী; দূরের তক্ষকবন হতে আসে আর মাঠময়, হাওয়াময় উড়ছে ভাষা, ফিসফিস হতে হতে আবার ভাষা–ভাবের ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে গেল

একটি তক্ষক সঞ্চরণশীল ও একটি পেয়ারাগাছ দ্বিবীজপত্রী; আপাতত তক্ষকবর্ণ ধরছে, কিছুটা তক্ষক হয়ে উঠছে

জন্ম : ১২ এপ্রিল ১৯৪৬ • মৃত্যু : ১১ জানুয়ারি ২০২৪

প্রয়াণ

দেবারতি মিত্রের কাব্যজগৎ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

‘সীতা-সতী-সাবিত্রী’ ধাঁচের বস্তাপচা পরিচিতি পরিহারকারী মেটামরফোর্সড ‘চারু’, স্বোপার্জিত স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে স্বাধীনভাবে মেলে ধরার আগ্রহে মহানগরের সড়কে নেমে আসা নিম্নবিত্ত-উদ্বাসিত ‘আরতি’; চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম সূত্রানুসারে প্রাচীনত্বের নাড়ির বাঁধুনি খুলে ফেলায় হাজির পারমিতা-সুতপা-মিস শেফালীর আর্থসামাজিক ভিন্‌জগৎ, তার সীমান্তহীনতার আবিষ্কারের আত্মমগ্নতা, ঘর-গেরস্থালির চৌকাঠের অপরপাড়ে সবলা আত্মনির্ঘোষটুকু পুঁজি করে নিয়মবদ্ধ নিত্যনৈমিত্তিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলল ‘ডি-কলোনাইজড্’ বাঙালিনি–এ হলো এমন এক সময় যখন তৃতীয় বিশ্বে তো বটেই, দুনিয়াজুড়েই বরং ধসে পড়ছিল বহু বহু শতাব্দীপ্রাচীন জগদ্দল পুরুষতান্ত্রিকতা মনে পড়ে কি সিরিমাভো বন্দরনায়েক-ইন্দিরা গান্ধী নাম্নী মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানদিগের উত্থান, কিংবা ফ্রয়েড-ফুকোর সেক্সোলজিস্ট তত্ত্বকথার পাশাপাশি সিমোন ডি বিভোয়ার ‘সেকেন্ড সেক্স’, ১৯৬০-এর ‘হাংরি টাইমবম্ব’য়ের ‘বঙ্গীয়’ বিস্ফোরণ, নারীমুক্তি আন্দোলন অনুসারী অবিস্মরণীয়, অন্যপূর্ব, অচিন্ত্যনীয় নারীবাদী বুদ্ধিজীবীতার ‘প্রতিবাদী’ বিস্ফার

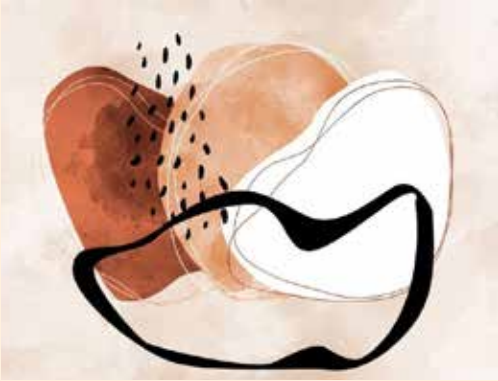

রবীন্দ্র, আনন্দ ও জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিতা দেবারতি মিত্রের কবিতা বস্তুত পুনরাবৃত্তিহীন আত্মসমীক্ষাময় চিত্ররূপতা, অবচেতনের ঘাত-প্রতিঘাতী আত্মউন্মোচী নিস্তব্ধ বা সুকোমল নির্ঘোষ। তাঁর কবিতা ইক্যুয়ালস্ টু ভিনজাগতিক, আত্ম-অনুসন্ধানী শব্দময়তার অভাবনীয় সংগ্রহ। কবিতাগুলো পাঠান্তে প্রশ্ন জাগে : কবিতার বাচ্যার্থ বিবেচ্য নাকি অন্যপূর্ব অনুভববেদ্যতা

এমন এক যুগান্তকারী পটভূমির উল্লেখ তাই অত্যন্ত আবশ্যিক এক দৃষ্টিকোণ, যা আদতে গতানুগতিকতা থেকে 'মেয়েবেলা'-র সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে রদবদলের মিছিলে হাঁটা মননসমৃদ্ধির এক সোচ্চার পদাতিক কবি দেবারতি মিত্রের সাহিত্যকর্মের প্রকৃত বোধবিন্দুর উন্মোচন যেন–(আমার নজরে)–দেবারতি মিত্রেরই কাব্যপঙ্‌ক্তিমাফিক 'রুপোলি সবুজ বন রজস্বলা নারীর শরীর'–এর মনস্তাত্ত্বিকতা উন্মোচনের প্রয়াস কিংবা কলঙ্কহীন পৌর্ণমাসীর গীতিবন্দনার অবতারণা যেন।

মগ্নচৈতন্যের কবি দেবারতি মিত্রের জন্ম ১৯৪৬। বিবাহ ১৯৭৫। স্বামী কবি মণীন্দ্র গুপ্ত। কেন জানি না কেবলই মনে হয় কবি দেবারতির কাব্যসাহিত্যের প্রথম 'তিনটি' মুকুলের সুঘ্রাণ যেন এই সমস্ত দিন-কাল-অব্দ-তারিখের লেবেলযুক্ত হয়ে আমাদের বোধভাষ্যির সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত (১৯৬৯) বই কৃত্তিবাস পুরস্কারে সম্মানিত 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে।' প্রাক-বৈবাহিক জীবনের পরবর্তী প্রকাশিত বই : 'আমার পুতুল' (১৯৭৪)। বিবাহের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত তৃতীয় কবিতার বই 'যুবকের স্নান'। দেবারতি ছিলেন মিত্র, বিবাহপরবর্তী হলেন গুপ্ত।

রবীন্দ্র, আনন্দ ও জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিতা দেবারতি মিত্রের কবিতা বস্তুত পুনরাবৃত্তিহীন আত্মসমীক্ষাময় চিত্ররূপতা, অবচেতনের ঘাত-প্রতিঘাতী আত্মউন্মোচী নিস্তব্ধ বা সুকোমল নির্ঘোষ। তাঁর কবিতা ইক্যুয়ালস্ টু ভিনজাগতিক, আত্ম-অনুসন্ধানী শব্দময়তার অভাবনীয় সংগ্রহ। কবিতাগুলো পাঠান্তে প্রশ্ন জাগে : কবিতার বাচ্যার্থ বিবেচ্য নাকি অন্যপূর্ব অনুভববেদ্যতা? আমরা দেখি। কিন্তু এই দেখা বা তাকিয়ে থাকা বা অবলোকনগুলো নিটোল দর্শন-উদ্ভাসন-প্রতীয়মানতায় রূপান্তরিত হতে পারে কি? দেবারতি মিত্রের কবিতাপঙ্‌ক্তির সূত্রে এইসব ক্রিয়াবাচক বৈভিন্ন্যের দৃশ্যটি নজরে পড়ে। চোখ দ্যাখে, একইসাথে ট্রান্সমিটও করে বটে। কবি-কলমের কৃপায় সেইসব টুকরো টুকরো অনচ্ছ দৃশ্যাবলি, নানান বিশৃঙ্খলা, মনের ভার, দুঃস্বপ্নের ঢের–মগজের ডার্করুম বাহিত হয়ে গুচ্ছগুচ্ছ নিঃশব্দ প্রসেসড অক্ষরজন্ম পায়; চিন্তা-ভাবনায় মথিত করে, মজবুত করে–কবিব্যক্তিত্বের নিভৃততম অতল-বিতল-নিতলের অনবদ্য বিষয়ব্যঞ্জনা, শব্দচিত্রাবলির অন্তরকথন আপন সুষমা-চারিমায় মোহিত করে রাখে। আর সেইসূত্রে আমরা পাই 'বাজনা গাছ', 'চেপ্টা আলো', 'গোধূলিরঙ্গের কালো মেয়ে', 'ঘন নীল জবাপাতা', 'ঢালু জল', 'নিঝুম অভ্র', 'সমুদ্রের বিষ ঘুণ' ইত্যাকার শব্দচিত্রের অক্ষরজন্ম, নতুন্তর বহুরৈখিক কবিতা শিরোনাম–আদতে যা অনুভূতির অনুসন্ধানে ব্যগ্র করে তোলে পাঠককে, আত্মসমীক্ষায় প্ররোচিত করে। কবিসত্তা বনাম দেবারতির ব্যক্তিসত্তার এমনই তো নিভৃত অনুরণন। নিজের কবিতার মর্মকথা ব্যাখ্যা দিয়ে কবি নিজেই জানিয়েছিলেন–'কবিতা একটা আশ্চর্য অ্যালকেমির ফল। সাড়ম্বরে লিখতে বসি না। অথচ নীরবে কথা বলি নিজের সঙ্গে, তাকিয়ে থাকি এবং খুঁজি নিজের মধ্যে–আমার ভিতরের জগৎকে চেতনস্তরে ভাসিয়ে তোলবার জন্য।' আমার চাই স্টিমুলি। বাস্তব থেকে হয়তো একটা গাছ, একজন মানুষের মুখ, একখানি আকাশ আমাকে দপ্ করে জাগিয়ে দিলো। আমি দেখলাম ছিপছিপে গাছটি আসলে ঘুম-ফ্রকের বোতাম খোলা একটি কিশোরী।' এমনই নিরহংকারী, নিরিবিলি অক্ষরস্ফুটন সূত্রে আমরা পড়ি 'যুবকের স্নান' বইয়ের প্রথম কবিতাটি–'একটি বাজনা গাছ' :

'একটি বাজনা গাছ' :
সে যেন আরম্ভ হলো এইমাত্র
মেঘঝোরা ঘিরেছে শ্যাওলা
পাথরের কথা বলা বনভূমি–
কেশর ফাটানো ফুল
তাম্ররেখা
স্ফুলিঙ্গের মতো ওড়ে রেণু

ধু-ধু শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে...
অনেক গ্রীষ্মের শেষে তোমাদের আমলকি বাগানে
জংধরা শিকল জড়ানো পরিত্যক্ত কুয়ো–
বহুদূরে
লুপ্ত বালিকার চাউনির মতো চুপজল
আকন্দ পাতায় কাঁপা হাল্কা কর্পূর কণা কণা
আবছায়া তারাফুটকি সাপ।

আলতো সবুজ ঝিঁঝি থোকা থোকা
সমস্ত গা গুঞ্জরণময় একটি বাজনা গাছ
গোল ফোয়ারার মতো আকাশের নিচে
সে যেন আরম্ভ হলো এইমাত্র।

কবি এখানে নিজেকে এক বহুতন্ত্রী গাছ হিসেবে কল্পনা করেছেন। এক খণ্ডহর যেন জীবন। পুড়েঝুরে তামাটে, নানাবিধ শিকর-বাকড়ে পরিপূর্ণ। জংধরা শিকল জড়ানো পরিত্যক্ত কুয়ো গোছের ভগ্নপ্রায় আবহ থেকেই কবি সংগ্রহ করেছেন তাঁর কবিতার মনোবীজ; নজর এড়িয়ে যায় কি অন্যান্য সব অনন্য চিত্র-উপহার : মেঘঝোরা ও (গতানুগতিকতার আনডিস্টার্বড শ্যাওলা-রূপক, পাথর আর বনভূমি গোছের (প্রতিদ্বন্দ্বী) দুই সৈনিকের বিচিত্র সহাবস্থান = অর্থাৎ এক স্বীকৃত লড়াইয়ের 'অকথিত' আভাস; যা স্ফুলিঙ্গের মতো রেণু বা পুষ্পরজের উদ্গারের মতন কনক্লুসিভ নিশ্চিতির দিকে টেনে নিয়ে যায় আর তখন অবস্থিতির চতুর্দিকে ভূচাল, বালিকাকালের নীরব কান্নাবিধুর 'চুপজল'-এর ঢের ঢের গ্রীষ্ম পেরিয়ে কর্পূরের ভিনি ভিনি সৌরভে পৌঁছান তিনি (লোকাচারে উল্লেখ পাই সাপের স্বপ্ন দেখা নাকি সন্তান-কামনার দ্যোতক, ক্রমে ঝিঁঝি-ডাক। দুঃসাহসিক এবং যুগধর্ম-অস্বীকারী এক প্রয়োগের উচ্চারণ এরপরে : 'গোল ফোয়ারার' মতো আকাশের নিচে' শরীর বেজে ওঠে সুরে। সে তখন শব্দময়। এ এক বাস্তব পরিচিত্রণ; অনুপস্থিতির আড়াল থেকে উচ্চারির শব্দবর্ণের পরিদৃশ্যমান যৌবন-চেতনা। গুঞ্জরিত হচ্ছে 'আকাশ' ও 'ভূমির' যৌথতা, ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় সচেতন অচেতনতা : ধ্বনিমগ্ন হয়ে উঠছে তারুণ্য। এমনই শুভারম্ভ। নিজের কবিতা-প্রকরণ সম্বন্ধে তাঁর কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় দেবারতি লিখেছেন :

'সাম্প্রতিক সমস্যা, সংঘর্ষ, সংঘাত, নিরুপায় বঞ্চনা বেশিরভাগ সময়েই সোজাসুজি আমার কবিতায় আসে না, কারণ আমি খবরের কাগজ, তত্ত্বের বই এবং সমস্ত রকম মতবাদকেই কবিতার শত্রু হিসেবে বড় ভয় করি। কিন্তু এই সময়ের একজন মানুষ হয়ে মুখের রেখায় অশ্রু, হাসি,

দুঃস্বপ্ন, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা, কাতরতা প্রভৃতি কোনো কালছাপই লুকোতে পারি না, লুকোতেও চাই না।'

উদ্ধৃতিটি থেকে 'সোজাসুজি' শব্দটিকে মার্কার পেন দিয়ে দাগিয়ে রাখলাম। অর্থাৎ এই সমস্ত 'অশ্রু, হাসি, দুঃস্বপ্ন, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা, কাতরতা'-র কালছাপ অস্তিত্বকে তিনি 'স্বী' থেকে 'কার' করে নিচ্ছেন। এবং তারই প্রভাবে আত্মকথাকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। স্বীয় কাব্যকৃতি সম্বন্ধে কবি দেবারতি মিত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যার একটি টুকরোর উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করাই খুবই দুরূহ। কবি লিখেছেন–

'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে'-র কবিতাগুলো লেখা হয়ে যাবার পর বুকে হেঁটে সরীসৃপের মতো কর্কশ পাথর আঁকড়ে অনেক কষ্টে স্যাঁতসেঁতে গর্ত থেকে আমি বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করি। প্রাণপণ চেষ্টার ফলে গর্তের মুখ খুঁজে পাই। তখন ভোরবেলাকার শুকতারা আলোয় চারদিক টলটল ছলছল করছে। তখন চৌকোকে মনে হয় তেকোনা, লম্বাকে বরফি ছাদের, অসংখ্য সমতলকে গোল। এ এক উপত্যকা যেখানে নিথর সাদা হচ্ছে সবুজ। কোবাল্ট ব্লু পাথুরে গোলাপি, চুন হলুদ হয়তো-বা শূন্যতার রঙে রূপান্তরিত! কি মধুর সেই বিভ্রম!'

এই উক্তিটির 'রূপান্তরিত' আর 'বিভ্রম' শব্দদুটি নিশ্চিতই ভিন্ন গোত্রীয় শব্দছবি। একইভাবে চিহ্নায়িত করি নিজেকে আটকে পড়া সরীসৃপ মনে করার পাশাপাশি গর্তটিকেও স্যাঁতসেঁতে ভেবে নিয়েছেন যে পরিবেশ থেকে বহু কসরতের পর তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। নিজেই জানিয়েছেন 'মুক্তি' অথচ তা যে এক বিভ্রম বা ভ্রান্তি। বিপথ-বিপাক-বিপদ। তবে একটি হেঁয়ালির উচ্চারণ রেখেছেন একই নিশ্বাসে : তা এক মধুরিমাও বটে। তাই অন্যত্র লিখছেন তার 'মেয়েলি শরীরকথা'র বিস্ময়স্পন্দন–

'জলপাত্রের মতো আমি লজ্জাহীন
আমারও পিপাসা ছিল, আমি শুধু সান্ত্বনা চাইনি
(কবিতা : 'তোমার জ্যোৎস্নার সুর')

কিংবা 'একজন সমবয়সী তরুণের প্রতি' কবিতায় লেখেন

'পঞ্চদশী কিংবা কোনও ষোড়শীর ললাটে, চিবুকে
ওষ্ঠে ব্যগ্র স্তনমূলে, তপ্তোজ্জ্বল শ্রোণীর সংকটে
একটি গোলাপি দাগ, খয়েরি-পিঙ্গল রক্ত তিল
জেনো বন্ধু আমি আছি এক কণা মুগ্ধ উষ্ণ স্বেদ
আপ্লাবন উপহারে খুঁজে পাই বিদ্রোহের মিল।'
(বই : অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে।)

অর্থাৎ, প্রাক-বিবাহ পর্যায়ে লেখা যৌনতার অবিস্মরণীয় কুমারী-চিত্রহার। সর্বপ্লাবী 'মনস্তাত্ত্বিক' সঙ্গম-রূপকথা। পূর্বোল্লিখিত পটভূমিটির উচ্চারণ রেখেছি একারণেই : নতুন যুগের ভোরে কবি দেবারতি লিখছেন তাঁর বিভোয়া উদ্দীপিত 'আত্মকথা।' কিংবা পড়ি যদি নামকবিতার ঠিক পূর্ববর্তী কবিতা 'অভাবিত মধ্যযাম' :

'চাঁদ নিবে গেছে তবু বিশাল নির্জন জলে
এখনো বিশাল কোমল আভা ঝরে,
অভাবিত মধ্যযাম।
এ মুহূর্তে ওই হিম জলের ভিতরে
আমার বাহুতে অক্টোপাস
উরুদেশে জলজ সবুজ সরীসৃপ,
আগ্নেয় পর্বত থেকে সহসা নির্গত
অতর্কিত বুকে ঠোঁটে–ঘূর্ণি আগুনের চাপ
অবয়বশূন্য, অন্ধ, ভূতগ্রস্ত
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায় প্রতিহত বুঁদবুদের মতো।

হে ঈশ্বর, হে ঘুমন্ত নির্বিকল্প জলের আকর
মূর্তিময় শীতলতা
এক মুহূর্ত তুমি জলস্তম্ভ হও।'

প্রশ্ন জাগে, এ কি যাপিত জীবন-কথা নয়, সঙ্গমোত্তর বিরামচিহ্নকথা? শুধু নিছক কল্পনা? 'পাহাড়ী স্নানের ঘর' শীর্ষক কবিতায় লেখেন :

'শরীরে খেলছে ওই নতুন সতেজ শিরা যেন
পাথুরে মাটির বুকে পিয়াশাল গাছের শিকড়
আমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি স্নানে ডুবে গিয়েছিলে
তারপর, বলো তারপর?'

বিনা বাক্যব্যয়ে আমি শুধু 'পিয়াশাল' উচ্চারণটিকে চিহ্নিত রাখলাম। কয়েকটি কবিতাশীর্ষক পেরিয়ে আমরা পৌঁছই 'তোমার স্নান' আর 'তোমার ও আমার স্নান' শীর্ষক কবিতা-যৌথতায়, যেখানে কবি জানাচ্ছেন–

'সারা দুপুর আমি তোমায় স্নান করিয়ে দিই
ডিমের মতন গড়ানো মসৃণ
ঢেউ তুলেছে ঠান্ডা স্নানের ঘর...
আমি তোমায় জম্বুদ্বীপের জলপাই তেল মাখাই
সরের স্নেহে শক্ত দুহাত ভিজিয়ে রেখে
সাহস করে সূক্ষ্ম তারের যন্ত্র ছুঁই...
চন্দন কস্তুরী চাঁপা জোয়ার এলে ভাসাই,
জলে নামো, মুখ নামিয়ে আমি পাশে দাঁড়াই।...

রাজহংসের মতন বিভোর ডানায় ভেসে যেন স্বপ্নপুরির ঝাড়লণ্ঠন ডুবে আছ।

সারা দুপুর এমনি করে থাকি,
আমি তোমায় স্নান করিয়ে দিই।'

পরবর্তী কবিতা 'তোমার ও আমার স্নান।' কবি লেখেন :

'আমার চোখের লোর দেখতে দেয় নি আর কিছু,
আমি শুধু রক্তমাখা বেণী খুলে মাথা করে নিচু
গাঢ় কল্লোলে ডুবেছিলাম।...
গভীর সোনায় টলোমলো
সবুজ ময়ূরপঙ্খি তুমি সামনে কি তাই দোলো?...

তোমার চুম্বন আর স্বপ্ন নয় এখন আভাস।'

(যতবারই পড়ি, কবি বিনয় মজুমদারের 'ভুট্টা সিরিজ', 'চাঁদের গুহার' কথা মনে পড়ে)।

কবির দ্বিতীয় বই : আমার পুতুল। নজর দিই শেষ কয়টি কবিতায় যেমন 'পদ্মগোখরোর শিস', বা 'স্তব, আদর, পাগলামি কিংবা যাহোক কিছু' অথবা সেক্সুয়ালিটির চূড়ান্ত প্রকাশ 'পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা দুজন' ইত্যাদি।

'রুপোলি সবুজ বন রজস্বলা নারীর শরীর
যতদূরে যাও তত আরো খুলে যায়'

মদালসা ওম ঠোঁটে ঘন মধু টেনে আনে দাঁত...

বাঘের উদগ্র চোখ ধকধক জ্বলে দুটি স্তনবৃন্ত...

চুপিচুপি গুঁড়ি মেরে তুমি টাইগার ঘাসে ডুবে
গুমড়ানো শিকড়ের গতিবেগ ছুঁয়ে দেখো
আমার গভীরে...
পদ্মগোখরোর শিস একটানা নিষ্ঠুর নিঃঝুম।
(কবিতা : পদ্মগোখরোর শিস)

যুগের প্রেক্ষিতে এ কবিতা নিশ্চিতই একটি অতি-সাহসী উচ্চারণ। কিংবা লেখেন :

'আমার দারুণ লোভ হয়েছে
তুমি আমার খুব ভিতরে চলে আসো*
নিবিড় গোপন ভ্রূণ আমার জরায়ুতে বাড়ো
আমি তোমায় লালন করি...
আমার প্রতিরোমকূপের স্নেহ তোমায় ভিজিয়ে রাখুক।'
(কবিতা স্তব, আদর, পাগলামি কিংবা যাহোক কিছু)

প্লাথ-টেড হিউজের মতোই মিত্র-দম্পতিও স্বামী-স্ত্রী জুড়ি নারীবিশ্বের পিকাসো। দেবারতি মিত্রের পছন্দের লোক ছিলেন না কী সিলভিয়া প্লাথ? বস্তুত, নারীত্বের অবলুপ্তি নয়, বরং নারীত্বের বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়ে সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘোষণা করাই তো নারীবাদী অন্বেষণের মূল প্রতীতি। তাই আত্মসমর্পণের মতো হারাকিরিতে বিশ্বাসী ছিলেন না দেবারতি। সেখানেই তিনি বিজয়িনী

লক্ষণীয় চলে এসো নয়, ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি আদতে 'আসো', অর্থাৎ চিত্ররূপটি একটি (completed task), সম্ভবত যা একটি অভ্যাসের ইঙ্গিতও বহন করছে।

'পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা দুজন

'প্রিয়তম পুরুষটি এক পা একটুখানি উঁচু করে
বিছানায় ভেসে আছে দেবদূত
সুকুমার ডৌলভরা মাংসল ব্রঞ্জের ঊরু...
হঠাৎ সচল হয়ে ডাকে তরুণীকে।
দুহাতে জড়ানো নারী
তার ঊর্ধ্বশরীরের গভীর সৌকর্য ফেলে রেখে

গা শিরশিরে লোভে
দুপায়ের ফাঁকে এসে মুখ গুঁজে দেয়

কীভাবে ঠিক আগে মাইলমাইলব্যাপী সরলবর্গীয় বনে ঝড়
একটানা আতশবাজির তীব্র রংচঙে চক্কর স্তনান্তরে ঢেউ লাগে
অসম্ভব অনুরক্তা শিশুসুলভতা নিয়ে
অচেনা আশ্চর্য এক লালচে কিসমিসরঙা ফুলের কোরক মুখে
টপ করে পোরে মাতৃদুধের মতো স্বাদু রস টানে।
ক্রমে তার মুখে আসে
ঈষদচ্ছ অনতিশীতোষ্ণ গলা মোম
টুপটাপ মুখের গহ্বরে ঝরে পড়ে
পেলিকান পাখিদের সদ্যোজাত ডিম ভেঙে জমাট কুসুম নয়,
একটু আঁশটে নোনতা স্বচ্ছ সাদা জেলি।
ভরে যায় আত্মা অবধি পর্ণপুট
অপার্থিব মৌচাকের টলটলে মধু, মিষ্টি ঘামে।

অস্থির রমণী গাঢ় উষ্ণ আরামে
পালতোলা জাহাজের ডেকে শুয়ে
মাধ্যাকর্ষণহীন ফুরফুরে মোলায়েম
হালকা জ্বলন্তপ্রায় একরাশ বেলুনের ঝাঁক নিয়ে
বিদেশি তারার খুব কাছাকাছি ভেসে যেতে থাকে
যেন ডানা মেলে দেবদূত উড়ে যাবে
এক্ষুনি বিছানাসুদ্ধ তাকে নিয়ে।

মেয়েটির উচ্ছল তৃপ্ত ওষ্ঠাধর, দাঁত, দুচোখের পাতা
চটচটে ঘন লাক্ষারস মাখামাখি,
সজীব রঙিন শান্ত সুস্থ জানুসন্ধির মধ্যিখানে
আস্তে আস্তে তার মুখমণ্ডল আঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে
পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী।

এই উচ্চারণ অত্যাধুনিক। আগামী দিনের সংকেতবাহী। দেহজ প্রেমকথার মন্ত্রোচ্চারণে নির্ভীক ও বৈপ্লবিক তাঁর কণ্ঠস্বর। যা ওই তিনটে বইয়ের অসংখ্য কবিতায় আহরিত। বেশকিছু দুরন্ত উচ্চারণে ঋদ্ধ এই কবিতাসমগ্রে যেমন :

'জ্বলন্ত গাছের মতো ঈশ্বরের ভয়ার্ত তর্জনী'
'নিজস্ব রক্তই শুধু হৃৎপিণ্ড হৃদয়ে ফেরায়' (বাড়ি)
'ভয় কেন, বিষ ঘুণ মৃত্যু ঠিকই চেনে
যথার্থ সময় হলে
তীরবেগে জল ভেদ করে খোঁজে
বালির বিবর।'

যৌবন চেতনার পাশাপাশি উনিশশো ষাট-সত্তরের যুগধর্মিতাও তাতিয়েছিল কবিকে। সপ্রমাণ হাজির করি 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে' কবিতা-বই থেকে 'ব্যথাহত দূরের কবিতা' শিরোনামের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন–

'সময় লুণ্ঠন করে সমুদ্রের ধন
অবশেষে সম্রাটের মাথার মুকুটে
লাবণ্য ঝরেছে তার কী লজ্জিত দীনহীন আভা।
সমুদ্রের ধন = লবণ
লবণ = ঘাম = শ্রম।
শ্রমের সেই লাবণ্য কিন্তু সম্রাটের মুকুটে চড়ে
লজ্জিত আর তখন তার আভাও দীনহীন দ্যুতি

যেকোনো সাম্রাজ্য–সে রোমান হোক মুঘল অথবা ব্রিটিশ : আদতে তো শোষণের ইন্দ্রপ্রস্থ। (ব্যথাহত দূরের বিকেলে)

দেবারতি মিত্রের বেশকিছু কবিতাপঙ্‌ক্তি যেন। হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়া বাক্যবন্ধ। গুটিকয় শব্দ/ চিত্র। অনুভব-জড়িমা; যতিচিহ্নের বিলোপ! হারিয়ে গেছে যেন, হঠাৎ থেমে যাওয়া inconclusive statement। কবি লিখছেন :

'সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি দুঃখ কী জীবন্ত স্নিগ্ধ রঙ।
শান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে একেলা,

এসময়ের রচনা হলে কমপক্ষে দুটি যতিচিহ্ন ব্যবহার হতোই। অনভিধানিক শব্দের প্রয়োগও নজরে পড়ে : যেমন দূশ্রু নদী (পৃ. ১১১)। বা 'অক্ষমার্হ ইত্যাদি।

কবির চতুর্থ বইয়ের নাম 'ভূতেরা ও খুকি', যেটি প্রথম তিনটে বইয়ের থেকে ভিন্নতর প্রয়োগে ভাস্বর। ভূত শব্দের অর্থ কি? প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ভূত, প্রেতাত্মা বা অশরীরী হলো মৃত ব্যক্তির আত্মা যা জীবিত ব্যক্তিদের সামনের দৃশ্য, আকার গ্রহণ বা অন্য কোনো উপায়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম। ভূত কথাটির অর্থ তবে কি প্রাচীনত্ব? অশরীরীজন? নাকি আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী : বিদ্যমানত্ব? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু? সংঘটিত বা পরিণত কিছু? 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে' ইত্যাদি প্রথমদিকের তিনটে বইয়ের কবিতাগুলোকে বলা যায় কোনো আত্মকেন্দ্রিক নিভৃতচারিণীর সংলাপ, পরবর্তী পর্বের, বিশেষত সপ্তম বই 'খোঁপা ভরে যায় তারার ধুলোয় পৌঁছে' কবি যেন তাঁর অভ্যস্ত লৌহবাসর পরিত্যাগ করে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠার প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। প্রথমদিকের কবিতাবইগুলোর ব্যক্তি দেবারতি আত্মসত্তার আনন্দকে অন্যের মধ্যে চারিত করে দেওয়ার প্রয়াসী। আর 'ভূতেরা ও খুকি' বা তৎপরবর্তী কবিতায় তিনি অন্যের অনুসন্ধিৎসা থেকে নারীত্বের মূল্যায়নে ব্রতী। সেই পর্বের কবিতাগুলোর নিবিড়পাঠ বারান্তরের জন্য তোলা থাক বরং।

প্লাথ-টেড হিউজের মতোই মিত্র-দম্পতিও স্বামী-স্ত্রী জুড়ি নারীবিশ্বের পিকাসো। দেবারতি মিত্রের পছন্দের লোক ছিলেন না কী সিলভিয়া প্লাথ? বস্তুত, নারীত্বের অবলুপ্তি নয়, বরং নারীত্বের বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়ে সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘোষণা করাই তো নারীবাদী অন্বেষণের মূল প্রতীতি। তাই আত্মসমর্পণের মতো হারাকিরিতে বিশ্বাসী ছিলেন না দেবারতি। সেখানেই তিনি বিজয়িনী। •

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
কবি ও প্রাবন্ধিক

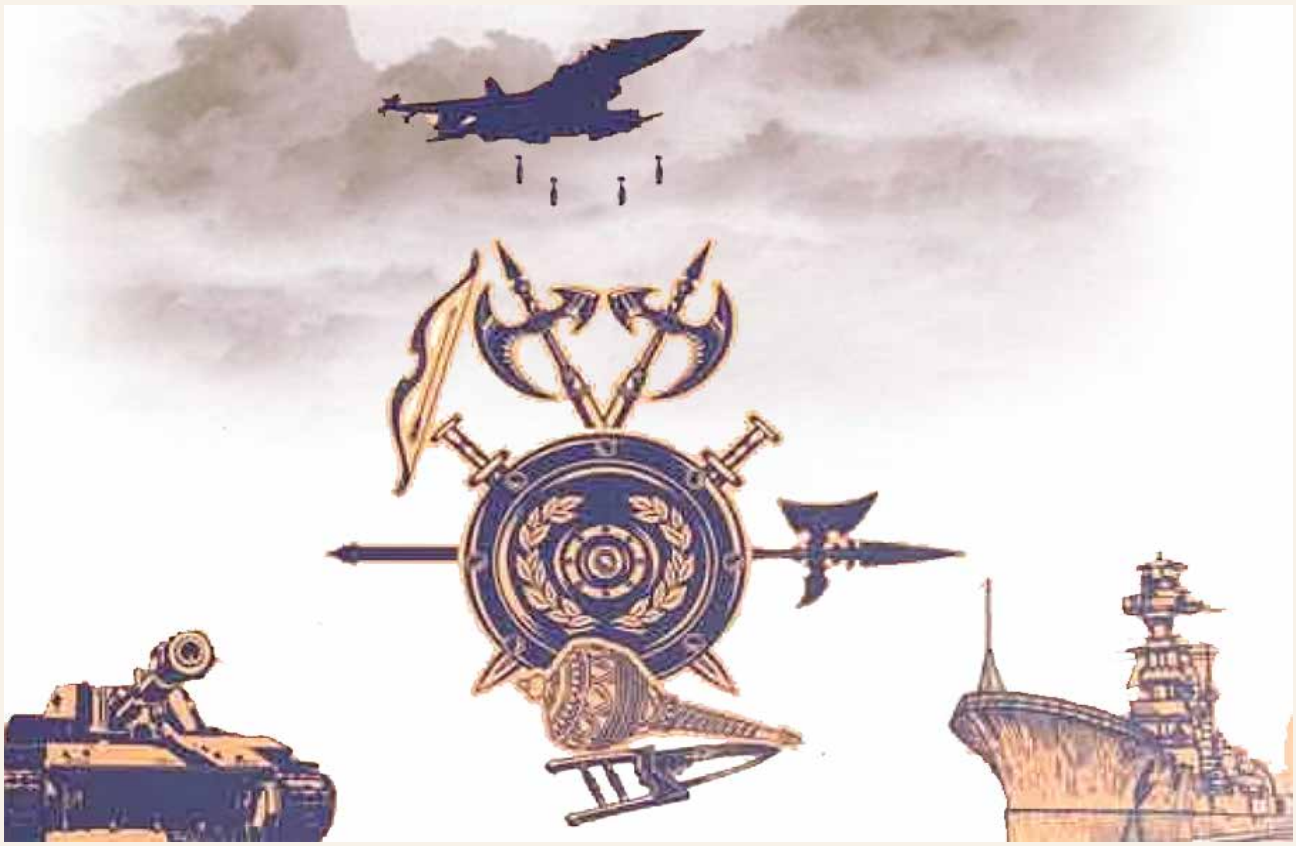

বিশেষ রচনা

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত মারণাস্ত্র ও আধুনিক অস্ত্র

স্বকৃত নোমান

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মাওসেতুং চড়ুই পাখিকে মানুষের শত্রু জ্ঞান করেছিলেন। বলেছিলেন, মশা-মাছি-ইঁদুর ও চড়ুই মানুষের শত্রু, এদেরকে দমন করতে হবে। কুকুর পালনও নিষিদ্ধ ছিল তখন। মাও সরকার মনে করত, কুকুর পালা বুর্জোয়া বিলাসিতা; একে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রশ্রয় দিতে পারে না। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চীনে কুকুর ছিল সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত।

ইঁদুর, মশা আর মাছি মারায় উপকার হয়েছিল হয়তো। কুকুরকে বঞ্চিত রেখে কী উপকার হয়েছিল জানি না। কিন্তু চড়ুই পাখি কী দোষ করেছিল? কেন তাদের নিধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? মাওসেতুং মনে করতেন, চড়ুই পাখি খেতের শস্য খেয়ে ফেলে, তাই চড়ুই পাখিও মেরে ফেলতে হবে। নির্দেশ তামিল হলো। মারা হলো লাখ লাখ চড়ুই। সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সেনাবাহিনীও অংশ নিয়েছিল চড়ুই নিধনে। অর্থাৎ মাওসেতুং প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করেছিলেন। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সর্বপ্রাণবাদকে অস্বীকার করে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন এই পৃথিবী কেবল মানুষের, প্রকৃতির গৌণ সন্তানরা এই পৃথিবীতে থাকতে পারবে না। ফলাফল হলো উল্টো

রামায়ণে হনুমানকে দেখতে পাই প্রধান চরিত্র রামের সহযোগী এবং ভক্ত হিসেবে। হনুমানের ভক্তি বাল্মিকী রামায়ণে যতটা না দেখতে পাই, তারচেয়ে বেশি দেখতে পাই কৃত্তিবাস, রঙ্গনাথন, তুলসীদাসের রামায়ণে। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, রামায়ণের কোন চরিত্রটি আমার প্রিয়? এক কথায় উত্তর দেবো, হনুমান। শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বাকপটুতার কারণে চরিত্রটি আমার প্রিয়। হনুমানকে দেবতার মহিমায় দীপ্যমান কোনো চরিত্র হিসেবে দেখি না, দেখি রামায়ণের একটি অসাধারণ চরিত্র হিসেবে, যে চরিত্র কবির কল্পনার বহুমাত্রিক রঙে রঞ্জিত। মানবীয় কল্পনা কতটা উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই হনুমান চরিত্রে

ফল পাওয়া গেল পরের বছরই। চড়ুই কমে যাওয়ায় বেড়ে গেল শস্য ধ্বংসকারী কীটের উপদ্রব। দেখা গেল, চড়ুই যতটা শস্যখেত ক্ষতি করেছে, তারচেয়ে কীটের কারণে কয়েক গুণ বেশি ক্ষতি হয়েছে।

আমি ভাবি ভারতবর্ষের কথা। কৃষিপ্রধান ভারতে দেখতে পাই সর্বপ্রাণের জয়জয়কার। ভারতীয় পুরাণে কোনো প্রাণকেই গৌণ করে দেখা হয়নি, প্রত্যেক প্রাণকে ভাবা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ, দেখা হয়েছে মানুষের পরিপূরক হিসেবে। হিন্দু দেব-দেবীরা তো নিজেদের বাহন হিসেবে নিয়েছেন বিভিন্ন প্রাণীকে। শিবের বাহন নন্দী বা ষাঁড়, দুর্গার বাহন সিংহ, বিষ্ণুর গরুড় বা ঈগল, ব্রহ্মার রাজহাঁস, গণেশের ইঁদুর, কার্তিকের ময়ূর এবং ইন্দ্রের হাতি। এভাবে প্রত্যেক দেবতার বাহন বিভিন্ন প্রাণী। কোনো দেবতার বাহন মানুষ নয়। একেক প্রাণীকে নিজেদের বাহন করে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

বাল্মীকিকৃত রামায়ণ মহাকাব্যে মানুষের পাশাপাশি বানর, হনুমান, ভাল্লুক, পাখি, সর্প প্রভৃতির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বাল্মীকি তাঁর রচিত রামায়ণে ১০৮০ বার 'বানর' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। ৪২০ বার বানরদের 'কপি' সম্বোধন করেছেন। বানরদের 'হরি' সম্বোধন করা হয়েছে ৫৪০ বার। ছদ্মবেশ ধারণে পটু হওয়ায় বানরদের 'কামরূপীন'ও বলা হয়েছে। পবনপুত্র মহাবীর হনুমান ছাড়া তো রামায়ণ প্রায় অসম্পূর্ণ। এক অসাধারণ পৌরাণিক চরিত্র হনুমান। রামায়ণে হনুমানকে দেখতে পাই প্রধান চরিত্র রামের সহযোগী এবং ভক্ত হিসেবে। হনুমানের ভক্তি বাল্মিকী রামায়ণে যতটা না দেখতে পাই, তারচেয়ে বেশি দেখতে পাই কৃত্তিবাস, রঙ্গনাথন, তুলসীদাসের রামায়ণে। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, রামায়ণের কোন চরিত্রটি আমার প্রিয়? এক কথায় উত্তর দেবো, হনুমান। শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বাকপটুতার কারণে চরিত্রটি আমার প্রিয়। হনুমানকে দেবতার মহিমায় দীপ্যমান কোনো চরিত্র হিসেবে দেখি না, দেখি রামায়ণের একটি অসাধারণ চরিত্র হিসেবে, যে চরিত্র কবির কল্পনার বহুমাত্রিক রঙে রঞ্জিত। মানবীয় কল্পনা কতটা উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই হনুমান চরিত্রে।

মহাভারতেও কি সর্বপ্রাণকে উপেক্ষা করা হয়েছে? মোটেই না। কুরুক্ষেত্রের অদূরে কর্ণের অসহায় মৃত্যুর কারণ একটি গরু। একদিন তিনি নিরপরাধ এক গোবাছুরকে একটি কর্দমাক্ত ডোবায় ভুলবশত বাণ নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলেন। গরুর মালিক অভিশাপ দিয়েছিল, যেভাবে এই বাছুর অসহায় অবস্থায় মরেছে, ঠিক একইভাবে কর্ণও একদিন এমনই অসহায় অবস্থায় মারা পড়বেন। কেউ তার সাহায্যকারী থাকবে না।

মহাভারতের মহাপ্রস্থান অধ্যায়ে দেখি কুকুরের গুরুত্ব। পাণ্ডবরা যখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন তখন তাদের পিছু নিল একটি কুকুর। দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন স্বর্গে প্রবেশ করতে। যুধিষ্ঠির বললেন, 'এই কুকুর আমার ভক্ত। আমার ইচ্ছা কুকুরটিও আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে।' ইন্দ্র বললেন, 'মহারাজ, আপনি স্বর্গসুখের মালিক হয়েছেন। এই কুকুরকে এবার ছাড়ুন। যার কুকুর থাকে সে স্বর্গে যেতে পারে না।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'এই কুকুর ছাড়া আমি স্বর্গ চাই না।'

আর সাপ? নাগরাজ বাসুকি তো শিবের গলায় নেকলেস হয়ে শোভা বৃদ্ধি করছে। শ্রীবিষ্ণু শুয়ে আছেন শীষনাগের ওপর ভর করে। সমুদ্র মন্থনের সময় কূর্ম তথা কাছিমের রূপ ধরে মন্দার পর্বতকে নিজের পীঠে তুলে নিতে সংকোচ করেননি বিষ্ণু। হীরণ্যাক্ষের হাত থেকে ভূদেবী তথা পৃথিবীকে উদ্ধার করতে তিনি বরাহের রূপ ধারণ করতেও সংকোচ করেননি। হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে তিনি সিংহের রূপ ধরতেও দ্বিধা করেননি।

মধ্যযুগের পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যেও দেখতে পাই সাপের উচ্চ আসন। চাঁদ সওদাগর কিছুতেই সর্পদেবী মনসার পূজা দেবেন না। মনসা সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন চাঁদের নৌবহর। চাঁদপুত্র লক্ষীন্দরের বাসরঘরে ঢুকে লক্ষীন্দরকে করলেন দংশন। এক পর্যায়ে চাঁদ সওদাগর মনসাকে পূজা দিতে বাধ্য হলেন। যে সাপকে তিনি নিকৃষ্ট মনে করলেন তার কাছেই তাকে হার মানতে হলো। এখানেই সাপের মাহাত্ম্য, এখানেই সর্বপ্রাণের গুরুত্ব।

শুধু প্রাণী কেন, ভারতবর্ষে গাছপালা-তৃণলতাকেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বট, তুলসি, বেল, অর্জুন, অশোক, কলাসহ প্রত্যেক গাছ-বৃক্ষকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। সে কারণেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বড় কোনো বৃক্ষ দেখলে তাকে প্রণাম করে, তার বেদীতে ফুল-ফল দেয়। নদ-নদী-সমুদ্রও ভারতীয় পুরাণে গুরুত্বপূর্ণ। শিব তার জটায় ধারণ করে আছেন নদী গঙ্গাকে।

মরুভূমি ও যন্ত্রসভ্যতার সুবিধাভোগী মানুষদের পক্ষে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের এসব মিথলজি বুঝে ওঠা কঠিন। ভারতবর্ষ সর্বভূতের মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিল। সে কারণেই উপনিষদে উল্লেখ, 'যে মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে।'

দুই.

যুক্তরাষ্ট্র 'গ্র্যামলিন' নামে এমন এক অত্যাধুনিক ড্রোন আবিষ্কার করেছে, যা দূরের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে সফল আঘাত হেনে 'মাদারশিপে' তথা গন্তব্যে ফিরে আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র এই ড্রোন আবিষ্কার করে ২০২০ সালে। সম্ভবত ড্রোনগুলো ইউক্রেনকে দিয়েছে এবং সেগুলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে ইউক্রেন।

আমি তো পুরাণচারী। পত্রিকায় 'গ্র্যামলিন'-এর খবরটি দেখে মনে পড়ে গেল পুরাণের এক বিশেষ শরের কথা। বাল্মিকী রামায়ণে এমন তিরের ব্যবহার দেখা যায়, যা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে আবার তূণীরে ফিরে আসতে পারে। রামচন্দ্রের কাছে এই তির ছিল, লক্ষ্মণের কাছে ছিল, হনুমানের কাছেও ছিল। সম্ভবত ভরত বা ভরতপুত্রের কাছেও ছিল। মনে নেই। কেবল রামায়ণে নয়, মহাকাব্য মহাভারতের অনেক মহারথীর কাছেই এমন তির ছিল, যা নির্দিষ্ট লক্ষবস্তুতে আঘাত হেনে আবার তূণীরে ফিরে আসত।

বীর বারবারিকের কাছেও ছিল এমন তির। বারবারিক ছিলেন ভীমপৌত্র তথা ঘটোৎকচ-অহিলাবতীর পুত্র। তার কথা মহাভারতে উল্লেখ নেই। কাশীদাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারতে পাইনি, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্যের অনূদিত মহাভারতে পাইনি, কাশীদাসী মহাভারতেও পাইনি। বারবারিকের উল্লেখ দেখতে পাই স্কন্দ পুরাণে। বিভিন্ন লোকগাথায়ও বারবারিকের আখ্যান রয়েছে। একটি আখ্যান এমন : বারবারিকের কাছে ছিল তিনটি বাণ। প্রথম বাণ দিয়ে তিনি শত্রুপক্ষ চিহ্নিত করতে পারবেন, দ্বিতীয় বাণ দিয়ে মিত্রপক্ষকে চিহ্নিত করে রক্ষা করতে পারবেন এবং তৃতীয় বাণ দিয়ে শত্রুপক্ষকে বিনাশ করতে পারবেন।

তিনটি বাণই নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে আবার তূণীরে ফেরত আসতে পারবে।

কিন্তু বারবারিক তার মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, যুদ্ধে তিনি দুর্বলপক্ষের হয়ে লড়বেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, এমনও তো হতে পারে যুদ্ধের কোনো একদিন কৌরবপক্ষ দুর্বল হয়ে গেল, তখন তো প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তোমাকে তাদের পক্ষে লড়তে হবে। তার মানে তোমার শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষ বিনাশ হয়ে যাবে। অতএব তোমাকে যুদ্ধে অংশ নেওয়া চলবে না। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করেন। কোনো কোনো আখ্যান মতে, বৃহত্তর স্বার্থে বারবারিক নিজেই নিজের মস্তক ছিন্ন করে কৃষ্ণপদে সমর্পণ করেন। কৃষ্ণ সেই ছিন্নমস্তক এক পর্বতশীর্ষে স্থাপন করেন। সেই ছিন্নমস্তক ছিল কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধের নিবিড় দ্রষ্টা। এই বিষয়ে পুরাণ বিশেষজ্ঞ ও কথাসাহিত্যিক শামিম আহমেদ ভালো বলতে পারবেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম বারবারিক সম্বন্ধে। তিনি বলেছিলেন, আখ্যানটি নেপাল অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

যাই হোক, কেবল তূণীরে ফেরত আসা তির নয়, শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছিল সুদর্শন চক্র। এটি এমন এক অস্ত্র, যা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে আবার ফেরত আসে। মহাভারতে এই অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। কৃষ্ণ এই অস্ত্র দিয়ে শিশুপালকে বধ করেছিলেন, পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে বধ করেছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতে এমন সব অস্ত্রের কথাও রয়েছে, যেসব অস্ত্র দিয়ে একদিনে, তিনদিনে কিংবা সাতদিনে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। যেমন পাশুপতাস্ত্র। অর্ধচন্দ্রাকৃতির এই অস্ত্র মন, চোখ, কথা এবং ধনুকের দ্বারা নিক্ষেপ করা যেত।

অর্থাৎ যোদ্ধা মনে মনে অস্ত্রটিকে আহ্বান করলেন, অমনি অস্ত্রটি ধনুকে এসে যাবে। যোদ্ধা চোখের ইশারা করলেন, অমনি সেটি নিক্ষিপ্ত হবে। যোদ্ধা আদেশ করবেন, অমনি সেটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে। পুরাণমতে, পশুপতাস্ত্র প্রধানত শিব ও কালীর অস্ত্র। সেকালের যুদ্ধে এ অস্ত্র কেবল মহারথীরাই ব্যবহার করতেন। সাধারণ যোদ্ধাদের কাছে এই অস্ত্র থাকত না এবং সাধারণ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কোনো মহারথী এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না বলে নিষেধাজ্ঞা ছিল। অস্ত্রটি নিক্ষেপিত হলে বিপক্ষদলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। মহাভারতে উল্লেখ, মহাদেবের কাছ থেকে অস্ত্রটি লাভ করেছিলেন মহাবীর অর্জুন।

আরেকটি মহা অস্ত্রের নাম ব্রহ্মাস্ত্র। এটি এমন শক্তিশালী, অপ্রতিরোধ্য ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র যে, দুই ব্রহ্মাস্ত্রের সংঘর্ষে পৃথিবীর প্রাণ-অপ্রাণ সমস্ত কিছু ধ্বংস করা করা সক্ষম। এই অস্ত্র ব্যবহারের পর অগ্নির ভয়ানক গোলা তৈরি হয়, ভয়ানক শিখা ও অগণিত ভয়ংকর বরে ঝলকানি ওঠে। গাছপালা, নদীনালা, সাগর-মহাসাগর, পশুপাখিসহ সমস্ত সৃষ্টি কাঁপতে থাকে, আকাশ বেষ্টিত হয় অগ্নিতে। হিমবাহ গলে যায়, অস্ত্রের ভয়ংকর শব্দে পর্বতগুলো ভেঙে যায়। রাবণের কাছে এই অস্ত্র ছিল। তদীয় পুত্র মেঘনাদের কাছেও ছিল। মহাভারতসহ একাধিক পুরাণে ব্রহ্মাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে সক্ষম বলে এই অস্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আর সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হলে শুধু অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাতেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা যাবে বলে নির্দেশ ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এই অস্ত্রের সন্ধান করেছিলেন। প্রতিহত করতে অর্জুনও সন্ধান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, দুই ব্রহ্মাস্ত্রের সংঘর্ষে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব সংযত হও সখা। কৃষ্ণের অনুরোধে অস্ত্র ফেরত নিলেন অর্জুন। কিন্তু অশ্বত্থামার জানা ছিল না এই অস্ত্র ফেরত নেওয়ার কৌশল। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অশ্বত্থামা অস্ত্রটি নিক্ষেপ করেন অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার গর্ভে।

পুরাণের আরেকটি অস্ত্র হচ্ছে ব্রহ্মশিরাস্ত্র। এটি ব্রহ্মাস্ত্রের চেয়ে চার গুণ অধিক শক্তিশালী। এ এমন এক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র, যা দেবতাদের অস্তিত্বকেও শেষ করে দিতে সক্ষম। ঋষি অগ্নিবেশ, পরশুরাম, কর্ণ, অর্জুন ও অশ্বত্থামা এই অস্ত্র ব্যবহার করার অধিকারী ছিলেন। তবে পরশুরামের অভিশাপে কর্ণ এই অস্ত্র সন্ধানমন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ, যখন এই অস্ত্র আহ্বান করা হয়, তখন আগুনের বিশাল গোলক ভয়ানক শিখায় জ্বলে ওঠে, বজ্রপাতের অসংখ্য শব্দ শোনা যায়, পৃথিবীতে ফাটল শুরু হয়, নদী শুকিয়ে যায়, হাজার হাজার উল্কা পড়ে যায় এবং সমস্ত প্রাণী প্রচণ্ড আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পাহাড়, জল, গাছপালাসহ সমগ্র পৃথিবী কেঁপে ওঠে। যখন এটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে, তখন এটি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পতিত স্থানে কিছুই জন্মাবে না, এমনকি পরবর্তী পঞ্চাশ ব্রহ্ম বছর (১৫৫.৫ ট্রিলিয়ন মানব বছর) পর্যন্ত ঘাসও গজাবে না।

অপরদিকে, নারায়ণী অস্ত্র স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর নামে নামাঙ্কিত। যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে বিষ্ণুর কাছ থেকে এই অস্ত্র লাভ করা সম্ভব ছিল। মহাভারতে উল্লেখ আছে অস্ত্রটির কথা। যে যোদ্ধা নারায়ণী অস্ত্র লাভ করতে পারত, সে সারা জীবনে মাত্র একবারই অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে পারত। মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে ব্রহ্মানন্দ অস্ত্রের কথাও। এই অস্ত্র গোটা বিশ্ব ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। আরেকটি অস্ত্র হচ্ছে ভার্গব অস্ত্র। ব্রহ্মশিরাস্ত্রের মতো সমান ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা রাখে ভার্গব অস্ত্র। পুরাণ অনুসারে, এই অস্ত্র ব্যবহার করা হলে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমনভাবে ধ্বংস হবে যে ছাই পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। ব্রহ্মাস্ত্র ও ব্রহ্মশিরাস্ত্রকে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে ভার্গব অস্ত্র। এ ছাড়াও মহাভারতে আগ্নেয়াস্ত্র, নাগাস্ত্র এবং বরুণাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে ব্যাসদেব এলেন হস্তিনাপুর প্রাসাদে। সঞ্জয়কে দিলেন এমন এক দিব্যদৃষ্টি, যা দিয়ে তিনি হস্তিনাপুরে বসে কুরুক্ষেত্রের সব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলেন। দেখে দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সেই দিব্যদৃষ্টি আজকের স্কাইপি, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার–যা দিয়ে আমরা বাংলাদেশে বসে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি, মানুষটিকে দেখতে পারি।

ব্রহ্মাস্ত্র মনে করিয়ে দেয় বর্তমানের পরমাণু বোমার কথা। ব্রহ্মশিরাস্ত্র মনে করিয়ে দেয় হাইড্রোজেন কিংবা থার্মোনিউক্লিয়ার হাইড্রোজেন কিংবা পারমাণবিক বোমার কথা। নারায়ণী অস্ত্র মনে করিয়ে দেয় বর্তমানের মিসাইল অস্ত্রের কথা। সে যুগে এমন অস্ত্র ছিল কিনা, এই তর্ক বৃথা। কেননা পুরাণকে কখনো যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। হয়তো পৃথিবীতে এমন এক যুগ ছিল, যে যুগে বর্তমান পৃথিবীর চেয়েও ভয়াবহ সব মারণাস্ত্র ছিল। সেসব অস্ত্রের কথা মুখে মুখে বাহিত হয়ে বাল্মিকীর কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাসদেবের কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কিংবা, না, কোনো যুগে এমন কোনো মারণাস্ত্র ছিল না। এ স্রেফ বাল্মিকীর কল্পনা, ব্যাসদেবের কল্পনা। বিস্মিত হই তাঁদের কল্পনার দৌড় দেখে, তাঁদের কল্পনাশক্তি দেখে। সেই কত হাজার বছর আগে তাঁরা এমন এক অস্ত্র কল্পনা করেছিলেন, যা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে আবার ফেরত আসে। সেই অস্ত্র মানুষ এখন তৈরি করেছে। তাঁরা কল্পনা করেছিলেন এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করা সম্ভব, গোটা পৃথিবী ধ্বংস করা সম্ভব। সেই অস্ত্র তৈরিও মানুষ আজ সম্ভব করে তুলেছে–পারমাণবিক বোমা। তাঁরা কল্পনা করেছিলেন এমন এক যন্ত্র, যা দিয়ে হস্তিনাপুরে বসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখা যায়। এখানেই কবি-সাহিত্যিকের শক্তি। এই কারণেই কবি-সাহিত্যিকরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তাঁরা মানুষের সর্বোচ্চ সাধ্যসীমাকে কল্পনা করে নিতে পারেন।

কথাশিল্পী অমিয়ভূষণ মজুমদার এক সাক্ষাৎকারে শেক্সপীয়রকে আধুনিক নাট্যকার বলেছিলেন। বলেছিলেন, সফোক্লেস বিশ শতকের শেষে এসেও আধুনিক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও আধুনিক কবি। বলেছিলেন, অর্জুন, ভীম, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য–এদের কাছে এমন অস্ত্র ছিল (কবির কল্পনায়) যা দিয়ে সাত দিনে, তিন দিনে, এক দিনে পৃথিবী ধ্বংস করা যেত। ভীষ্ম নিজে প্রাণ দিলেন, অথচ সেই অস্ত্র ব্যবহার করলেন না। জয়দ্রথ-রথে নিজেকে নিধন করতে হবে জেনেও অর্জুন চক্রব্যূহ ধ্বংস করতে তাঁর পাশুপতাস্ত্র ব্যবহার করেননি। ব্যক্তির নিজের মতের চাইতেও মানবকল্যাণ বড়–এই কল্পনা কবি ব্যাস করেছিলেন। আর আমরা মাত্র কয়েক মেগাটনের মালিক হয়ে এখন পর্যন্ত পৃথিবীকে পারমাণবিক বোমার ভয় থেকে আশ্বস্ত করতে পারিনি। এই জন্য ব্যাসদেবকে রেগান বা আন্দ্রোপভ থেকে আমরা অনেক বেশি আধুনিক বলতে পারি। •

স্বকৃত নোমান
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

অলংকরণ : মিজান স্বপন

ছোটগল্প

রুবি না!

অরুণ কুমার বিশ্বাস

'এই কেসের সবচে আচানক জিনিস কী জানেন ডিটেকটিভ...!' এটুকু বলেই অমনি ব্রেক কষলেন ইন্সপেক্টর কৌশিক হোসেন। কথায় কথায় রহস্য তৈরি করা তার স্বভাব। আধমাথা কাঁচাপাকা চুল অপরাধ জগতে তার অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত বহন করে। দীর্ঘ চাকরি জীবনে চোর-ছেঁচড়, খুনে-ডাকু তিনি কম ঘাঁটেননি। সত্যি বলতে কি, এই কেসটা কৌশিকের কাছে একটু বিটকেল বলেই মনে হয়। কেসটা কী বলুন তো! একটু খুলেমেলে বলুন ইন্সপেক্টর, আমার তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে। মৃদু হেসে বললেন দুঁদে গোয়েন্দা অলোকেশ রয়।

তাহলে আমি বরং শর্টকাটেই বলি, নাকি বলেন অলোকেশ! জানি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। নানান কাজে আপনাকে মাথা গলাতে হয়। কফিবারে বসে ক্যাপাচিনোর কাপে চুমুক দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর।

এবার চওড়া হাসলেন অলোকেশ। কৌশিকের কথাটা সিধাভাবে নিলে প্রশংসাই বলতে হয়। আর যদি তা না হংয় তো তাহলে ব্যজস্তুতি। অর্থাৎ প্রশংসার পোশাক পরিয়ে আদতে অলোককে তিনি খোঁচা দিলেন।

সে যাক, কৌশিক কাজের কথায় এলেন। তার মতে ভিকটিম নিজেই খুনিকে একপ্রকার ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, যদিও এখন আর তিনি বেঁচে নেই। হাসপাতালের নিতে নিতে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে

যারপরনাই আশ্চর্য হন ডিটেকটিভ অলোকেশ। সে কি! ভিকটিম নিজেই আততায়ীর পরিচয় প্রকাশ গেছেন! তা আবার হয় নাকি!

হয় না মানে! আলবাত হয়। এই দেখুন ডিটেকটিভ, অকুস্থল থেকে আমি তার ছবি তুলে এনেছি। এখানে প্রমাণাদি সব পাবেন। বেশ উৎসাহের সঙ্গে স্মার্টফোনে তুলে রাখা ছবিখানা অলোকের সামনে তুলে ধরেন ইন্সপেক্টর কৌশিক হোসেন। জাঁদরেল অফিসার তিনি। তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কোনো কাঁচা কাজ তিনি করেন না।

অলোকেশ ছবি দেখলেন। রক্তাক্ত বডি শুয়ে আছে মেঝেতে, পাশেই সদ্য চুনকাম করা দেয়ালে একটি নাম–রুবিনা! রক্ত দিয়ে লেখা, তাই অনুমান করা যায় ভিকটিম মারা যাবার আগে নামখানা আঙুল দিয়ে লিখে গেছেন। যাতে তিনি নিজে মরলেও আততায়ী কোনোভাবে রক্ষা না পায়। তার যেন সমুচিত শাস্তি হয়।

হুম! তারপর বলুন কৌশিক, তদন্ত কদ্দুর এগোল? আপনি মিছে আমার কাছেই-বা কেন এলেন? কেস তো মোটামুটি সলভ্ড! আচ্ছা, এই রুবিনা মেয়েটির সাথে ভিকটিমের কী সম্পর্ক! কেন সে খুনটা করলো জানতে পারলেন কিছু?

ইন্সপেক্টর মেদুর হেসে তারপর বললেন, কেসের প্যাঁচটা তো সেখানেই ডিটেকটিভ। ভিকটিমের সঙ্গে রুবিনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ময়নুল সাহেবের মেয়ে সে।

ময়নুল! কে ময়নুল?

ময়নুল মানে যে খুন হলো।

অলোক কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কৌশিক, আমি কি খুনের স্পট একবার দেখতে পারি!

ওসবের দরকারও নেই কৌশিক। জানেন তো নদী মুছে গেলেও তার দাগ থাকে। আমি ওই দাগটুকুই দেখতে চাই।

ওকে, নো প্রবলেম! মাথা নাড়লেন কৌশিকক। যাবেন এখন? যেখানে খুন হয়েছে ময়নুল, সেই রুমটা অবশ্য আমি 'সিল' করেই রেখেছি। যাবেন তো চলুন, মিছে সময় নষ্ট না করাই ভালো। লাশ অবশ্য আপনি পাবেন না, ওটা মর্গে রাখা আছে। পোস্টমর্টেমও হয়ে গেছে।

অলোক মনে মনে ভাবলেন, আহা, কত সহজে একটা মানুষ স্রেফ বডি বা লাশ হয়ে যায়! দুদিনের এই দুনিয়ায় স্বার্থের জন্য আমরা কতো কী করি!

ফার্মগেট পশ্চিম রাজা বাজারে মসজিদ গলির একটি বহুতল ভবন। তার নীচতলায় সপরিবার থাকতেন ময়নুল সাহেব। তার স্ত্রী, বড় দুই ছেলে আর মেয়ে আছে। মেয়ের নাম রুবিনা। সরকারি তিতুমীর কলেজে সে অনার্স পড়ছে।

কৌশিক সাহেব সাদাপোশাকে ছিলেন, দারোয়ান তাই তাকে চিনতে না পেরে গড়িমসি করছিল। পরে তার পরিচয় পেয়ে দারোয়ান শশব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং ময়নুলের পরিবারের সবাইকে নিমিষে জড়ো করে ফেলে। বলা বাহুল্য, উর্দির মেলা দাম, অনেক ক্ষমতা!

আগে আমি অকুস্থল দেখবো। চলুন দেখা যাক। সংক্ষেপে বললেন অলোকেশ। তার মগজে আপাতত একটা কথাই ঘুরছে–মেয়ের হাতে পিতা খুন! কী মর্মান্তিক!

সিল ভেঙে ঘর খোলা হয়। পুরো রুমখানা খুটিয়ে দেখলেন অলোক। কথায় বলে, রক্তের দাগ সহজে মোছে না। ঠিক তাই। ময়নুল খুনের কাছে যে দেয়াল, সেখানে স্পষ্ট চোখে পড়ে 'রুবিনা'–ময়নুল সাহেবের অনার্সপড়ুয়া মেয়ে। সে এই কেসের প্রাইম সাসপেক্ট। কৌশিক হোসেন নিজেই অবশ্য জানালেন, রুবিনাকে এখনও অ্যারেস্ট করা হয়নি।

কেন! কেন হয়নি? বিস্মিত অলোক। এই কেস জলবৎ তরলং। এই তো, পষ্ট লেখা আছে রুবিনার নাম। আর একজন মৃত্যুপথযাত্রী কখনও ভুল কিছু লিখবে না, এটা ধরে নেয়া যায়। রুবি'র পরে একটুখানি গ্যাপ দিয়ে 'না' লিখেছেন। ছুরিখাওয়া একজন মানুষ এরচে পরিষ্কার করে কি আর লিখতে পারতেন!

প্রমাণ ছাড়া তো কাউকে গ্রেফতার করা যায় না ডিটেকটিভ। মওকা পেয়ে অলোককে খানিক আইন শেখান ইন্সপেক্টর কৌশিক। 'তা কেন, উপরঅলা বললে যাকেতাকে ধরে গারদে পোরা যায়!' আনমনে বললেন অলোক।

কিছু বললেন?

না না, তেমন কিছু না। আমি ভাবছি, এইখুনের মোটিভ কী! আমি যদ্দুর জানি, মানে ফ্রয়েড সাহেব বলে গেছেন, মেয়েরা সাধারণত বাপের প্রতি খুব দুর্বল হয়। এর নাম ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স। এখানে তো সেই সূত্র মিলছে না।

কথা বলতে বলতে রুমখানা খুঁজে দেখেন অলোক। লাশ যেখানে পড়েছিল সেই জায়গাটুকু লালরঙের মার্কার দিয়ে দাগ দেয়া আছে। ময়নুলের লাশ মেঝেতে পাওয়া যায়। মাথা খাটের দিকে, আর বাকিটা দরজার দিকে। খুনটা হয় মধ্যরাতে বা আরও পরে। কোনো চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যায়নি। ময়নুলের ঘরের দরজা অবশ্য খোলা ছিল। রাতে তিনি একাই ঘুমাতেন।

পিএম রিপোর্ট পেয়েছেন বললেন। একটু দেখা যাবে?

'আলবাত যাবে। ওই বস্তু আমি পকেটে নিয়েই ঘুরি, অন্তত যদ্দিন না কেসের কিনারা হয়।' সহাস্যে বললেন ইন্সপেক্টর কৌশিক। অলোকেশ খেয়াল করে দেখলেন, ভদ্রলোকের হাসিটা সুন্দর। পুলিশের হাসি নরমালি এমন হয় না। ওরা হাসতে জানে না, সব্বাইকে অপরাধী মনে করে।

বাঁ হাতে পিএম রিপোর্ট, আর ডানচোখ মেঝেতে, মানে খুনের স্থলে। অলোক কী যেন মিলিয়ে নিচ্ছেন।

কৌশিক বললেন, কী দেখছেন অত! কেসে তো মালমসলা কিছু নেই। শুধু ভাবছি মেয়েটা ওর বাপকে খুন করলো কেন!

অলোকেশ চুপ। ওঁর মগজের ভিতর নিউরনগুলো দুর্বার গতিতে স্থানবদল করছে। নাহ, ফ্রয়েডসাহেব ভুল করতে পারেন না। মেয়ে কেন তার বাবাকে খুন করবে! হোয়াট ফর?

প্রায় মিনিট চারেক বিরতি নিয়ে অলোকেশ বললেন, এই দেখুন ইন্সপেক্টর, খুনি দাঁড়িয়ে ছিল (বসেও থাকতে পারে, কেননা, বসে ছুরি মারা যাবে না এমন কোনো কথা নেই) ভিকটিমের দেহের বাঁপাশে। দেয়ালটাও সেদিকেই। অথচ খুনি চাকু মেরেছে ময়নুলের বুকের ডান দিকে। কিন্তু কেন? বাঁ পাশ থেকে বা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভিকটিমের বাম বুকে ছুরিকাঘাত করাই তো সহজ ছিল! তাতে আঘাতের অভিঘাতও জোরালো হত। অথচ পিএম রিপোর্ট উল্টো কথা বলছে। খুনি ময়নুলের বুকের বাঁপাশে নয়, বরং ডান দিকে ছুরি মেরেছে। আশ্চর্য নয়!

কৌশিক কী যেন ভাবলেন। তিনি অলোকের কথার অন্তর্নিহিত যুক্তি বুঝে উঠতে সময় নিচ্ছেন। তাই তো! হাতের কাছে পেলে কে মিছে দূর ঠ্যাঙাতে যায়। তিনি যুক্তিটা বুঝলেন, কিন্তু কী করে এমন হল তা বলতে পারছেন না।

আপনিই বলুন ডিটেকটিভ, কী করে এমন হল? হাল ছেড়ে দেন স্মিত হাসির ইন্সপেক্টর।

হতে পারে! গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন অলোকেশ। খুনি যদি 'ন্যাটা' মানে বাঁহাতি হয় তাহলেই কেবল সম্ভব! জানেন তো, বাঁহাতি যারা তাদের কব্জিতে প্রচণ্ড শক্তি থাকে। নইলে ময়নুলের মতো শক্ত-সমর্থ লোকের বুকের প্রায় ছ'ইঞ্চি গভীরে ছুরিকাঘাত করা মোটেও সহজ হতো না।

ইয়েস! ইউ আর রাইট ডিটেকটিভ। কথাটা আমার মাথায় আসেনি। আমি শুধু বাপ-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছি। কেসের 'মৌডাস অপারেন্ডিতে' মন ছিল না মোটে।

এবার অন্যকথা বললেন অলোকেশ। আচ্ছা, খুনটা কি বাইরের কেউ করতে পারে?

না, পারে না। কারণ ভিকটিম নিজের হাতে খুনির নাম লিখে গেছেন। রুবিনা, তার মেয়ে তাছাড়া দারোয়ান নিশ্চিত করেছে যে সারা রাত্তিরে বাইরে থেকে কেউ ভিতরে আসেনি, বা ভিতরের কেউ বাইরে যায়নি। আই'ম শিওর, খুনটা রুবিনাই করেছে। বেশ জোর দিয়ে বললেন কৌশিক হোসেন।

রুবিনা কি বাঁহাতি?

এখনও জানি না। জিজ্ঞেস করতে হবে। ভদ্রলোকের সুরে ইন্সপেক্টর বললেন।

হুম! খুনি যেই হোক, সে বাঁহাতি। ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন ইন্সপেক্টর। নিন, এবার ডাকুন সবাইকে। আমরা দুজন মিলে যৌথজেরা

সেরে ফেলি। দেখি, খুনির চেহারা কেমন! সকৌতুক বললেন অলোকেশ। তাকে বেশ পরিতুষ্ট দেখাচ্ছে। এই 'বাঁহাতি' ক্লু দিয়েই খুনিকে পাকড়াও করা যাবে বলে তার অনুমান। কারণ ঘরে ঘরে ন্যাটা ব্যাটসম্যান পয়দা হয় না।

ময়নুলের বসার ঘরে পরিবারের সকলে উপস্থিত। এককোণে দারোয়ান রকিবুলও আছে। খুনের ব্যাপারে তার ঔৎসুক্য প্রবল।

ময়নুলের স্ত্রী সখিনা বেগম একমাথা ঘোমটা টেনে বসেছেন। দুই ছেলে সোমত্ত কিন্তু ব্যাচেলর, মামুন আর জুম্মন, তারা বাপের ব্যবসা দেখে।

রুবিনা সোফায় বসে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তার কাঁপুনির রহস্য বুঝতে খুব বেশি পণ্ডিত হতে হয় না। খুনি হিসেবে পুলিশ তাকেই সাসপেক্ট করছে। কারণ ময়নুল দেয়ালের গায়ে তার নাম লিখে গেছেন।

কাকে আগে জেরা করবেন? ইশারায় জানতে চান কৌশিক। অলোক চুপ। তিনি বুঝতে পারছেন, খুনটা হয়তো রুবিনা করেনি, তবে ওর নামের সাথে ময়নুল খুনের কিছু একটা জবরদস্ত কানেকশন আছে।

সবাইকে চমকে দিয়ে অলোক বললেন, বলো রুবিনা, বাবাকে কেন খুন করলে? তার কসুর কী ছিল?

বাবারে আমি মারি নাই ছার! মারি নাই। অমনি মরাকান্না জুড়ে দেয় রুবিনা। বাবা আমারে কত আদর করতো!

ইন্সপেক্টর কৌশিক এমনধারা নাকিকান্না ঢের শুনেছেন। এতে তার কোনো মনোবিকার হয় না। তিনি বেরসিকের মতো বললেন, খামোশ! মিছে কথার জায়গা পাওনি। বলো, কেন খুন করলে?

রুবিনার কান্না থামলো, বাক্যও থামলো। সে আর কিছু বলে না। সদ্যোজাত বাছুরের মতো সে করুণ চোখে অলোককে দেখে। যেন চাইলে অলোকেশ তাকে বাঁচাতে পারেন।

মামুন আর জুম্মনকে কিছু মামুলি প্রশ্ন করলেন অলোকেশ। ওরে ব্যাপারে কৌশিকেরও কোনো আগ্রহ নেই। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে খুনটা রুবিনা করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল তিনি যদি এতটাই শিওর হলেন, তবে মিছে কেন অলোককে এই কেসে যুক্ত করা!

অলোক রুবিনার কাছে গিয়ে বসলেন। গোপনে কিছু জানতে চাইবেন হয়তো। কিন্তু আদতে সেসব কিছু না। তার পকেট থেকে বলপেন মেঝেতে পড়ে গেল। রুবিনা সসম্মানে অলোককে ওটা তুলে দেয়। ডান হাত দিয়ে।

ইন্সপেক্টরের দিকে ইশারা করেন অলোকেশ। যেন বলতে চান, রুবিনা এই খুন করেনি, সে নির্দোষ। নাউ ইটস ইওর টার্ন ইন্সপেক্টর। প্রকৃত খুনিকে খুঁজে বের করুন।

অমনি বাটা মাছের মতো খাবি খান কৌশিক। বলে কি বেটা! রুবিনা খুনি নয়! ময়নুল তাহলে রক্ত দিয়ে তার নাম লিখলো কেন! হোয়াই?

সময় পেরোয়। ঘড়ির কাঁটায় টিক টিক টিক! ঘরের মধ্যে কটন-ড্রপ সাইলেন্স। সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।

মামুনের হঠাৎ মনে হল, এদের কিছু খাবার অফার করা উচিত। একটু আতিথেয়তা। সে কাকে যেন ডেকে বলল, রুবাই, চা-নাশতা আনো।

অমনি কুড়ি বাইশ বছরের এক মেয়ে চোখে পড়লো। কাজের মেয়ে বোধ হয়। পোশাকআসাক দেখে তাই মনে হয়। পরিপাটি তবে তার পরনে কমদামি পোশাক। মামুন বলামাত্র চা-নাশতা আপেল এসে গেল।

সে গাঁয়ের মেয়ে। প্রায় বছরখানেক সে এ বাসায় আছে। নাম তার রুবাই। তাকে কি একটু জেরা করে দেখবে! কাজের মেয়ে বা দারোয়ানরা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে।

সে হবে'খন। খাবার এসে গেছে। আগে এগুলোর সৎকার হোক। তারপর জেরাফেরা, অন্যকথা। অলোক ভাবলেন।

সবুজ আপেল। ক্যানসার না-হবার পক্ষে ভালো। অনেকে ভুল করে বলে বসেন যে, ক্যানসারের জন্য ভালো। যেন আপেল খেলে কর্কট রোগ হয়! বাঙালির বাংলাটা যে কবে ঠিক হবে!

খাবার তুলে নিতে এলে অলোক রুবাইকে নিরিখ করে দেখলেন। মেয়েটা মিষ্টি, মায়াবী দেখতে, তবে চাহনিতে কেমন যেন ক্রুরতা। রুবাই, তুমি ভালো আছো? জাস্ট কথার কথা, তাই বললেন অলোকেশ।

নো জবাব। অলোক আবার বললেন, তুমি কি রুবি? আই মিন ভালো নাম?

এবারেও চুপ। তবে কি মেয়েটা মূক, মানে বোবা! ওর চোখদুটো জ্বলে উঠলো যেন! আজকের জামানায় অবশ্য বোবা থাকাই ভালো, শত্রু পয়দা হবে না। আরবিতে একটা কথা আছে, 'মান সাকা তা সালিম'। মানে যে নীরব রইলো, সে নিরাপদ থাকলো।

অলোকেশ পানি খেয়ে রুবাইর দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দেয়। ও গ্লাসটা নিয়ে নেয়। প্রথমে বাঁ হাত বাড়ায়। পরে অবশ্য ডান হাত দিয়ে গ্লাসটা সে নিল। রুবাই কাজের মেয়ে হতে পারে, বাট শি'জ টু ক্লেভার। অলোকেশ মনে মনে বললেন।

খানাদানা শেষ, এবার জেরা। একে একে সব্বাইকে প্রশ্ন করতে চান ইন্সপেক্টর কৌশিক হোসেন।

উঁহু! মাথা নাড়লেন অলোকেশ। তার আর দরকার নেই। খুনি কে আমি জেনে গেছি।

রিয়েলি! সিরিয়াস বিষয় নিয়ে জোকস করবেন না প্লিজ।

কৌতুক নয়, খুনি আমাদের সামনেই আছে।

কে সে? বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকালেন ইন্সপেক্টর কৌশিক।

কাজের মেয়ে রুবাই। সম্ভবত তার আসল নাম 'রুবি'। আপনারা জানেন কিছু? সবার উদ্দেশ্যে বললেন অলোক।

কেউ কিছু না বললেও সখিনা বিবি জানালেন, ওর ভালো নাম রুবি। তার বাপের বাড়ি থেকে আমদানি হয়েছে এই চালিয়াত জঘন্য মেয়েটি।

প্রথমে না-না করলেও পুলিশি চাপ বেশিক্ষণ ওর সহ্য হয়নি। দুই ধমক খেয়ে রুবাই ওরফে রুবি চুপ মেরে যায়। সখিনা বলল যে সে ইতোমধ্যে চাকরিতে জবাব দিয়ে বাড়ি যাবে জানিয়েছে। পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়েও ফেলেছে রুবাই।

তাই নাকি! আনুন তো দেখি ওর পোঁটলা! রক্তমাখা ছুরিখানা সেখানেই আছে বলে আমার অনুমান। অলোকে তৃপ্তস্বরে বললেন।

পোঁটলা এলো, অলোকের কতা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। রুবাইয়ের পোঁটলার মধ্যেই খবরের কাগজে মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায় সেই ছুরি।

কিন্তু ডিটেকটিভ, আপনি কী করে বুঝলেন যে রুবাই খুনি? কীভাবে? ওখানে স্পষ্ট রুবিনা লেখা আছে!

খুকখুক করে কাশলেন অলোকেশ। শুনুন ইন্সপেক্টর, প্রথম ক্লু বাঁহাতি খুনি! ময়নুলের মেয়ে রুবিনা তো বাঁহাতি নয়। দেখেছেন নিশ্চয়ই, একটু আগে সে ডানহাতে কলমটা তুলে আমাকে ফেরত দিল। ওটা ইচ্ছে করেই আমি মেঝেতে ফেললাম।

সেকেন্ড ক্লু, অকুস্থলে দেয়ালের গায়ে লেখা নাম 'রুবি-না'! না-এর আগে একটু গ্যাপ আছে দেখেছেন? তার মানে রুবি নামে এখানে কেউ আছে, বা থাকতে পারে যে কিনা বাঁহাতি।

কিন্তু অলোক ভায়া, ভিকটিম তাহলে শুধু 'রুবি'র নাম লিখবে, সাথে 'না' কেন লিখলো?

দেখুন ভাই, একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তি কী ভেবে কী লিখেছেন কে জানে! তবে আমি একে ব্যাখ্যা করেছি এভাবে, 'রুবি, না'! মানে তিনি রুবাই ওরফে রুবিকে খুনটা করতে নিষেধ করেছেন।

হুম! বুঝলাম। এরপর আর রহস্য থাকে না। মেয়েটি অলরেডি খুনের দায় স্বীকার করেছে।

রহস্য থাকে ইন্সপেক্টর। অলোক বললেন। এবার আপনি খুঁজে বের করুন, রুবাই কেন হঠাৎ তার মালিককে খুন করতে গেল। খুনের পেছনে মোটিভ কী!

কৌশিক মেয়েটিকে কছে ডেকে কানে কানে কী যেন বললেন। অমনি সে হড়হড় করে পেটের কথা সব উগড়ে দিল। টাকা! টাকার লোভে সে খুন করেছে মনিবকে। তবে নিজের ইচ্ছায় নয়, তার দুলাভাই ফায়েজ রয়েছে এর পেছনে। খুন করে সে পালায়নি, কারণ তাহলে খুনের দায় তার উপর এসে পড়বে।

বেশ, তবে তো মিটেই গেল। মাথা নাড়লেন অলোক। চলুন ইন্সপেক্টর, এবার আমরা বরং এই খুনের মাস্টারমাইন্ড ফায়েজকে খুঁজে বের করি।

ওকে, তাই চলুন। প্যান্টের কষি টাইট দিতে দিতে বললেন ইন্সপেক্টর কৌশিক হোসেন। •

অরুণ কুমার বিশ্বাস
কথাসাহিত্যিক

অলংকরণ : মিজান স্বপন

ধারাবাহিক উপন্যাস

বহ্নিলতা

অমর মিত্র

এখন বহ্নিলতা ক্লাস ইলেভেন। এখন বহ্নিলতা বড় হয়েছে। বহ্নিলতাই বলে চন্দননগর যাওয়ার দিনটির কথা। অতনু আর কুন্তলা অবাক হয়ে বনকন্যাকে দ্যাখে। আহা, গা দিয়ে এখনো যেন ইছামতি, গৌড়েশ্বর, রায়মঙ্গলের গন্ধ পাওয়া যায়। সেই গন্ধ কেমন তা তারা জানে না। দ্যাখেইনি ওইসব নদী আর নদীঘেরা দ্বীপ। কিন্তু আলাদা একটা গন্ধ, যা এই শহরে মেলে না, তাই। কালো রঙের মেয়েটি কী সুন্দর হাসে। মা বলে বহ্নিশিখাকে জড়িয়ে ধরে। মাসি বলে কুন্তলার হাত ধরল। জোড়হাতে নমস্কার করল অতনুকে, বলল, পিসের বন্ধু তুমিও পিসে।

বহ্নিলতা বলে, সেদিন ছিল মেঘলা। চন্দননগর না যেতে হলেও আমরা নিশ্চয় যেতাম না সেই সভায়। আমরা মানে পিসে। পিসের যাওয়া মানে আমাদের সবার যাওয়া। কেন যাবে পিসে? আমি তো হেঁটেছিলাম সেই ধর্মতলা পর্যন্ত। আমাদের তো মিছিলে হাঁটার অভ্যেস অনেকদিন। বিরামপুরা থেকে রায়পুর, দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু শিবির থেকে সুন্দরবন, মরিচঝাঁপি...।

কুন্তলা বলেছিল, বল মা বল

কমরেড আনন্দ মন্ডলের বাড়ি যাব, আমরা ট্রেনে করে শ্যামনগর গেছি মাসি, ট্রেনে শুধু সেই সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের কথা, কেউ বলে ঠিক, কেউ বলে অন্যায়। কেউ বলে, শিল্প হবে কীভাবে, আর একজন বলে, লোকের পেটের ভাত মেরে, এদিকে লোকের মুখে দু'রকম কথাই শোনা যায়, দুই পার্টির কথাই একসঙ্গে চলে, কথা কইতে ভয় নেই, আমাদের মথুরগঞ্জে এক পার্টি, সে আমলে এক পার্টি, এ আমলেও এক, দুরকম কথা হয় না, হওয়ার উপায় নেই।

নয়

শ্যামনগর যেন আলাদা জায়গা। বন্ধ চটকল আর দেহাতি হিন্দিভাষী মানুষ। যে দাঁড়িয়েছিল তাদের জন্য সে হলো রামলাল দুসাদ। চটকলের মজুর ছিল। তা বন্ধ হতে কাটাকাপড়ের বিজনেস করে। খুব ইচ্ছে একটা লেদ মেসিন বসায়, এখন রট আয়রনের কাজ হচ্ছে সবদিকে। চেয়ার, টেবিল, খাট, ইত্যাদি। তার ফ্যাক্টরি ছিল বি টি রোডের ধারে। সেখানে বড় আবাসন হবে শোনা যাচ্ছে। চটকল, বিস্কুটকল, বেকারি সব বন্ধ করে আবাসন। রামলাল তাদের দেখে খুব খুশি। বয়স বছর পঞ্চাশ। যখন কমরেড আনন্দ মন্ডল এই এলাকায় পার্টি সংগঠিত করতে আসেন, তখন সে বছর পনেরো। সে ছিল কমরেডের ছায়ার মতো। পার্টিতে যোগ দিয়ে পাকুড়ে চলে গিয়েছিল। সাঁওতাল পরগণা। তবে জেলে যেতে হয়নি। পালিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর নিজের কাকার কাছে গিয়ে উঠেছিল একেবারে অজগাঁয়ে। তাদের দেশও সাঁওতাল পরগণায়। ফিরে আসার পর চটকলে ঢুকেছিল। তখন সেখানেই কমরেডের সঙ্গে দেখা। কী অদ্ভুত লোক। কমরেড আনন্দ চটকলের প্রাইমারি ইস্কুলের টিচার হয়েছিল। বিপ্লব হবেই কমরেড। সংগ্রাম ফুরোয় না। একটা সংগ্রাম শেষ হয়, আর এক সংগ্রামের সূচনা হয়। কিন্তু কমরেড নিজেকে লুকোতে পারেনি। সংগঠিত করছিল শ্রমিকদের। এক বিপ্লবী তার কাজ ভোলে না। আর বিপ্লব তো একদিনে হয় না। সহস্র বছরও লাগতে পারে কমরেড। কাজটা ভুললে চলবে না। কমরেড আনন্দ মন্ডলের গা দিয়ে আলো ফুটে বেরোয়। তার কাজ গিয়েছিল। পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ইস্কুল থেকেই। তবে রাখতে পারেনি। তিনি জামিন পেয়েছিলেন পুলিস কেস সাজাতে না পারায়। কমরেড এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তাঁর ইচ্ছে সুশান্তকে কিছু বলে যান। বহ্নিলতা কী সুন্দর বলে সব। বলল, তিনি একটা পাহাড় মা, তিনি একটা গাছ, কেউ টের পায় না পাহাড় চলে-ফেরে, গাছ চলে-ফেরে। স্টেশনের ধারের রাস্তা থেকে অটোয় করে অনেক দূর গেলাম। নেমে হাঁটতে লাগলাম চারজনে। হাঁটতে হাঁটতে দেখি এক গাঙ। আমাদের ওদিকে গাঙ কত বড়। একুল ওকুল দেখা যায় না। জল আর জল। কিন্তু ইনি মা গঙ্গা। মনে মনে অনেক বড়। বাবুঘাটের মা গঙ্গা আর শ্যামনগর, চন্দননগরের মা গঙ্গা একই। এদিকেও আছেন, ওদিকেও আছেন। গঙ্গা পার হয়ে অটোয় করে তাঁর বাড়ি। সেও গঙ্গার কাছে এক পুরোন বাড়ি। শোনা যায় ফরাসীদের কুঠিবাড়ি ছিল। তার সব ভেঙে পড়েছে, একটুখানিতে আলো জ্বলে। মাসি, আমি এই প্রথম বিপ্লবীকে দেখলাম। পাহাড় বসে পড়েছে, তাকে ভেঙেছে অসুখ। এখন তো পাহাড় ভেঙে ভেঙে উন্নয়ন হয়, তোমরা নিয়মগিরির কথা জানো, সেও এক চলে বেড়ানো পাহাড়, সেও এক হেঁটে বেড়ানো গাছ, ছায়া নিয়ে ঘোরে মা, আমি চিনলাম, তিনিই সতীশবাবু কিংবা বিমলবাবু।

সেই মরিচঝাঁপির কথা বলছিস? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ মা, ঠিক যেন তাঁদের কেউ। বলে বহ্নিলতা। কী সুন্দর বলে। মাথা নাড়িয়ে চুল ঝাঁকিয়ে হাসি মুখে চোখে আলো জ্বালিয়ে বলে। বলে, যুদ্ধ কখনো থামে না মা, যুদ্ধ জারি থাকে সব সময়।

তুই এসব শিখলি কী করে? কুন্তলা জিজ্ঞেস করে।

আমি জানি মাসি, জানি।

কী করে জানলি, তুই কি তখন জন্মেছিলি? কুন্তলা অবাক হয়ে সব শুনতে চায়।

আমি যেন সব দেখেছি মা, শুনবা সেই কথা, আমাদের কী হয়েছিল সেই বন-পাহাড় ছেড়ে নিজ দেশে এসে। বহ্নিলতার চোখ দপদপ করে বলতে বলতে।

যখন মরিচঝাঁপি হয়, অতনু মেদিনীপুরে নিশ্চিন্ত চাকুরিতে, সুশান্ত বালুরঘাট জেলে। নিতাইহরি, বলাইহরি দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখছে। মরিচঝাঁপির বছর প্রবল বন্যা হয়। নদীগুলি একনাগাড়ে বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল জেলার পর জেলা। শুকনো ডাঙা, রেললাইন, নগর। কিন্তু বন্যা হয়েছিল ভাদ্র আশ্বিনে, ইংরিজি বছরের প্রথমে শীতের শেষে, মধ্য ফেব্রুয়ারি, ফাল্গুন মাস থেকেই মানা,মানাভাটা, বরদাভাটা, কুরুন্দ, নওগাঁ, সেই বিরামপুরা থেকে সবাই দেশে ফেরার কথা ভাবতে থাকে। সতীশবাবু, বিমলবাবু, রঙ্গলাল ডাক দিয়েছিল ফিরে চলো মাটির টানে। মরিচঝাঁপি যাত্রা করেছিল পনেরো বছরের বলাইহরি তার পঞ্চাশে বুড়ো তার বাবা আর মা ও বছরদুই বড় দিদিকে নিয়ে। সেই পাথুরে মাটির দেশের নির্বাসন ঘোচাতে মরিচঝাঁপি আসা। আসা মানুষের মতো বাঁচতে। বিমলবাবু, ধীরেনবাবু, সতীশবাবুকে সে দ্যাখেনি। বলাইহরি তার মেয়েকে বলেছে সেই দেশের সবচেয়ে বড় বড় পাহাড়ই যেন সতীশবাবুরা ছিল, সবচেয়ে বড় বড় গাছই সতীশবাবুরা ছিল। তাদের সব কাজ ছিল রাতে। দিনে পুলিশি নজর ছিল। পুলিশ টের পেয়ে গিয়েছিল দণ্ডকারণ্য, সতীশবাবু নামেই জানে সে। সতীশবাবু মার্না সব ক্যাম্প আর বেতুল জেলার উদ্বাস্তু ক্যাম্পে গিয়ে তাদের এক হতে বলছিলেন। বিরামপুরা, মানা, মানাভাটা, বরদাভাটা, কুরুন্দ, নওগাঁ ছিল মরুভূমি। তার বাবার আরো এক ভাই, দুই বোন ছিল, তারা মরেছিল ক্যাম্পে। সে যেন হিটলারের নাৎসি ক্যাম্প মাসি। তোমরা কেউ জানো না কী হয়েছিল।

তুই নাৎসি ক্যাম্প জানিস? বিস্মিত কম্পিত কুন্তলা জিজ্ঞেস করেছিল।

জানি, বহ্নিমা বলেছে, শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল আমাদের বিরামপুরা, মানা, মানাভাটা, বরদাভাটা সব অমনি ছিল, প্রায় অমনি, মানুষ যখন দয়ামায়া হারায়, অমনি করে হারায়, চোখের সামনে মানুষ না খেয়ে মরলে তেষ্টায় মরলে, তারা অমনি করেই নিজেরা ভালো থাকে, প্রাণে কোনো দুঃখ জাগে না।

অবাক কুন্তলা, অতনু বহ্নিলতার দিকে তাকিয়ে আছে। এ যেন ছিপছিপে কৃষ্ণকলি সতের বছরের এক কন্যা নয়, এ যেন শত শত বছরের কেউ। জগতের সব দেখেছে। এই মহাপৃথিবীর জন্ম মুহূর্ত থেকেই আছে পৃথিবীতেই। ধারণ করে আছে ক্লেদ আর মৃত্তিকার সমস্ত পূতিগন্ধ আর পুষ্পের সৌরভ।

বহ্নিলতা বলছিল, কত মানুষ ভাত না পেয়ে জল না পেয়ে মরেছিল ক্যাম্পে। সেই মরুভূমিতে জলের চিহ্ন ছিল না। প্রত্যেকদিন জল আসত ট্যাঙ্কারে। জল নিয়ে কাড়াকাড়ি হতো। আমরা জলের দেশের মানুষ, শুকিয়ে মরে যেতাম যদি না বড় পাহাড় বড় গাছ ডাক দিত, ঘরে ফেরো। আমি সেই সতীশবাবুরে দেখলাম শুয়ে আছেন বিছানায়। গাছ ভূলুণ্ঠিত হলে যেমন দেখায়, কাণ্ড শুকিয়ে যায়, পাতা শুকিয়ে যায়, শুয়ে পড়া গাছের একটুখানি প্রাণ রয়েছে তখনো, আমি চন্দননগরের কথা বলছি মাসি।

ঘরে আলো ছিল অপ্রতুল। বেশি আলো তিনি সহ্য করতে পারেন না। সবচেয়ে ভালো থাকেন অন্ধকারে। এক মহিলা ছিলেন, জাহানারা পারভিন। তিনি সেই মহাবৃক্ষকে বাবা ডাকছিলেন। তিনিই আনন্দ মন্ডলকে দ্যাখেন। সেবা করেন। সুশান্ত গিয়ে দাঁড়াতে তিনি যেন গন্ধ পেলেন। সুশান্ত, কমরেড! ডাকলেন জাহানারাকে, তুলে বসা মা।

তুমি শুয়ে থাকো বাবা। জাহানারা বললেন, উঠে বসার শক্তি তোমার নেই।

তিনি শুয়েই থাকলেন। চোখ বন্ধ করলেন। বন্ধ করেই থাকলেন অনেক সময়। জাহানারা বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনারা বসুন, এই ঘুমিয়ে পড়েন এই জেগে ওঠেন, অভিমান হয়েছে তুলে বসাইনি বলে, শিশুর মতো হয়ে গেছেন।

লম্বা একটা বেঞ্চে সকলে বসে আছে। শুধু সুশান্ত গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়ায়। আবার তিনি চোখ খুললেন, চাপা গলায় বললেন, কমরেড, যুদ্ধ জারি আছে?

হ্যাঁ, কমরেড। সুশান্ত শান্ত গলায় জবাব দিল। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল একটি রুটি দুভাগ করে খাওয়ার কথা। মনে পড়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে মধুকুন্ডা নেমে পাহাড়ি পথে হাঁটা। মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে দুজনে। পাতলা জোছনা। তাঁরা যাবেন অর্জুন মাহাতোর বাড়ি পেঁচাবিন্ধ্যা গ্রামে। যেতে যেতে তিনি বলছেন, বিপ্লবের গান উপন্যাসের কথা। বিপ্লবের গান পড়েছে সুশান্তও। সং অফ ওয়াং হাই। গণফৌজের

সেই সাধারণ সৈনিক কী করে অসাধারণ হয়ে উঠল সর্বহারার প্রেমে, পার্টির প্রতি বিশ্বস্ততায় সেই কথা বলতে বলতে চলল। আনন্দ মন্ডল বলছিলেন, গণ মুক্তিফৌজ গড়তে হবে। গণফৌজ যাত্রা করবে পাহাড় থেকে সমুদ্রে। তুমি সেই ওয়াং হাই, মনে আছে তার কথা?

সে কই? তিনি যেন খুঁজলেন কাউকে, সেই যে এক বনলতার কথা বলল কে যেন।

কে বলল? শিহরিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বহ্নিলতা।

তিনি বললেন, তিনি নাকি স্বপ্নে পেয়েছেন, এক বহ্নিলতা লালন করছে কমরেড সুশান্ত।

কে বলল? সুশান্ত চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল জাহানারাকে।

জানি না, স্বপ্ন ছাড়া কী আর দেখবে বাবা, যা দেখেন উনি সবই স্বপ্ন, কে আর আসে, রামলাল দুসাদ গঙ্গা পার হয়ে, আর চুঁচড়োর ললিত পাল, মগরার অমিতাভ সরকার, নীলিমা। বলল জাহানারা।

সুশান্ত বলেছিল, এদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। তাহলে কী করে তাঁকে খুঁজে বের করলেন কমরেড আনন্দ। কমরেড আমি সেই ওয়াং হাই, গণফৌজের জন্য বসে আছি, কমরেড।

সে কই? তিনি ঘাড় ঘুরিয়েই বহ্নিলতাকে দেখলেন। আলো ঝলমল হয়ে গেল তাঁর চোখমুখ। জাহানারাকে বললেন, আলো জ্বালিয়ে দে, জ্বালিয়ে দে মা।

জাহানারা বললেন, আর আলো কই, এইতো আলো বাবা।

তিনি শান্ত হয়ে বললেন, আমি তাহলে ভুল স্বপ্ন দেখিনি কমরেড?

সুশান্ত বললেন, স্বপ্ন ভুল হবে কেন?

আমি জাহানারাকে বললাম তোমাকে খবর দিতে, অগ্নিলতা লালন করছে কমরেড সুশান্ত রায়।

জাহানারা বললেন, হ্যাঁ, তাইই, এক সন্ধ্যায় বাবা বললেন চারদিক অশান্ত, মিছিলে মিছিলে মাটি কাঁপছে, বন-পাহাড় সুন্দরবনের দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে এক অগ্নিলতা নিয়ে এসেছে কমরেড সুশান্ত, তাকে একবার খবর দিতে হবে।

কী করে খবর দিলেন? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে জাহানারাকে।

জাহানারা বলল, রামলালকে বললাম, সে বলল, খুঁজে বের করবে।

সুশান্ত রামলালের দিকে তাকাতে সে বলল, শ্যামনগর ইস্টিশনে সন্ধেবেলায় কত মানুষ নামে, আমি ইস্টিশনে বসে থাকলাম কদিন বিকেল থেকে। কতলোক ফেরে কলকাতার দিক থেকে, কতলোক ফেরে রঠাঘাটের দিক থেকে, কাউকে কাউকে আমি জিজ্ঞেস করছি সুশান্ত রায়কে চেনে কি না, কে সুশান্ত রায়? কত সুশান্ত রায় আছে, কোন সুশান্ত রায়ের কথা বলতে চাইছি আমি? তখন আমি বুকে সুশান্ত রায় নামে একটা পোস্টার ঝুলিয়ে বিকেলে বসতে, একদিন একটা বুড়ো মতো লোক এসে জিজ্ঞেস করল, কোন সুশান্ত রায়?

কমরেড সুশান্ত রায়। আমি বললাম, কমরেড আনন্দর ইচ্ছা তাকে আবার দ্যাখেন, কিছু বলে যান।

সুশান্ত রায় সুন্দরবন থেকে একটা মেয়ে এনেছে, আগুনলতা, তাই তো?

আমি আন্দাজে বললাম, হাঁ, সেইই হবে। তখন লোকটা তার নম্বর দিল। আমি ফোন করলাম তার পরদিন সকালে। কিন্তু সেই লোকটা কে, যে ফোন নম্বর দিয়েছিল? রামলাল বলল, তা সে জানে না, কিন্তু এইভাবে সে কমরেডের নম্বর পেয়েছিল। লোকটা আর কোনো কমরেড হবে। বন্ধু। বন্ধু। কেমন দেখতে। এমনি দেখতে। লোকটার চেহারায় এমন কোনো বৈশিষ্ট ছিল না যা দিয়ে তাকে মনে রাখা যেতে পারে। শাদা-মাটা, প্যান্ট আর ফুল শার্ট, মাথায় অল্প চুল, চোখে চশমা, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তাকে সে শ্যামনগরে দেখেছে আগে, তাই মনে হয়। কিন্তু লোকটাকে আবার দেখলে সে চিনতে পারবে এমন কোনো কথা সে জোর দিয়ে বলতে পারে না। আবার না চিনবে যে তাও নয়। কিছু একটা হবে আবার দেখলে।

কী হবে? সুশান্ত জিজ্ঞেস করল।

রামলাল বলল, আনন্দ হবে, গা সিরসির করবে। তারপর রামলাল একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, লোকটা আপনার মতোও হতে পারে কমরেড সুশান্ত, আপনাকে দেখা ইস্তক আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে তিনি। সুশান্ত গত একমাসের ভিতরে এদিকে আসেনি। কিন্তু এমন কেউ এসেছে যে জানে বহ্নিলতার কথাও। আগুনলতা তো বহ্নিলতাই। বহ্নিশিখার ইস্কুলের অনেকে জানে এই বৃত্তান্ত। আর জানে অনিমেষ। অনিমেষ একা জানে তা নয়, থানা জানে যেমন, তার পার্টির কেউ কেউ জানে। একজন থেকে আর একজন। এমনি কেউ জেনেছিল আর সে এসে পড়েছিল শ্যামনগর স্টেশনে।

শুনতে শুনতে সুশান্ত বলল, ক'দিন সে আনন্দদার জন্য উতলা হয়েছিল সত্য, এমন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে মাটি, চারদিকে মানুষের পদধ্বনি, আনন্দদা, তুমি কোথায়, মিছিলে মিশে গেছ? তখনই ফোন এসেছিল। কে যে তার খবর দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সুশান্ত রামলালের দিকে তাকিয়ে থাকে। রামলাল বলল, কমরেড, আমি তো লিখাপড়া জানি না, বাংলায় নামটা লিখে দিল আমার বেটা, সে দুকান করে, আমার কী মনে হয়, বিপ্লব যেমন স্বপ্ন হয়, এইটা স্বপ্নই হবে, আমি কিছু বলতে পারব না আর, লোকটা ঐটা বলতেই যেন শ্যামনগরে নেমেছিল সেদিন, আমাকে সব লিখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ফিরতি গাড়ি কখন, বিশ মিনিট বাদেই ছিল, সে বসে থাকল খালি বেঞ্চে, আমি দেখতে লাগলাম, তারপর গাড়ি আসতে উঠে গেল, কেমন হলো বলুন সবাই।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল অতনু আর কুন্তলা, তারা জিজ্ঞেস করে, তারপর কী হলো।

বহ্নিশিখা বলল, উনি মানে কমরেড আনন্দ বললেন, উনি বুঝতে পারছিলেন স্বপ্ন সত্যি হয়।

সুশান্ত বলল, এর দুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় কমরেড আনন্দ তাঁর যৌবনের কথা বলতে বলতে ঢলে পড়লেন। সেদিন বহ্নিলতাকে পথে উত্যক্ত করেছিল দুই যুবক। তাদের দিকে সে রুখে গিয়েছিল। তারপর অবশ্য আর কিছু হয়নি। সেদিন অনিমেষ পথসভা করে আমাদের শাসিয়েছিল নাম না করে। সেদিন পুলিশ যথেচ্ছ লাঠি চালিয়েছিল বহুজনের মিছিলে। নন্দীগ্রাম থেকে বহু মানুষ পালিয়েছিল। নয়ই মারচ গুলি চালিয়ে নন্দীগ্রামের দখল নিয়েছিল সরকার এবং পার্টি। কিন্তু যুদ্ধ জারি ছিল। যে কোনো পক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করলে অন্যপক্ষকে যুদ্ধে নামতে হয়। তবে মরিচঝাঁপির যুদ্ধ একতরফা হয়েছিল। নিরস্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্রের যুদ্ধ। দন্ডকারণ্য থেকেই আরম্ভ হয়েছিল সেই আক্রমণ।

দশ

মরিচঝাঁপির পথে হাসনাবাদে পৌঁছে আটকে গিয়েছিল মিছিল। মিছিলই। আসার পথে কতবার প্রতিহত হয়েছিল তাদের যাত্রা। মধ্যপ্রদেশ সরকার চেষ্টা করেছিল পুলিস পাঠিয়ে আটকে দিতে, যেন নাৎসি শিবির থেকে পালাচ্ছে নিরপরাধের দল। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ পালন করেছিল তারা। মিছিল করে তারা হয় অন্ধ্র না ওড়িশায় প্রবেশ করে ট্রেনে চেপেছিল। হাওড়া। হাওড়া থেকে মিছিল গেল শিয়ালদা। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে হাসনাবাদে এসে মিছিল থামল। হাসনাবাদে এসে তারা শুনল, সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেবে না নতুন সরকার। সরকারের মন্ত্রী, শরিকদলের নেতা মিটিং করে ডেকে এলে কী হবে, বিরোধী পক্ষ থাকার সময় আশ্বাস দিলে কী হবে, এখন তাঁরা বলছেন, সকলে ফিরে যাক। যেতেই হবে। এত মানুষের ভার নতুন সরকার নেবে না। সরকার আর দল আলাদা। সরকারের প্রধান বলেছেন, না ফিরে যেতে হবে। সুন্দরবন নষ্ট করা যাবে না। প্রশাসন নদী পারাপারের নৌকো বন্ধ করে দিয়েছে। হাঙর, কুমির, কামটে ভরা খরস্রোতা নদী সাঁতরে তো পার হওয়া যাবে না। হাসনাবাদের নদী আর জল দেখে নিতাইহরির ছেলে বলাইহরি অবাক। তার বছর পনেরো-ষোল বয়স, জ্ঞান হওয়া থেকে সে দেখেছে শুখা মাটি শুখা নদী, জলের অভাব। মায়ের কথা, বাবার কথা বিশ্বাস হতো না, জলের দেশ কেমন তা সে দ্যাখেনি। সে মনে মনে ভেবেই নিয়েছিল, একবার যখন আসতে পেরেছে, আর ফিরবে না। রাতে তার বাবার কাছে শুনেছিল তাদের ওপারের দেশের কথা। ইছামতীর ওপার বাংলাদেশ, তখন ছিল পাকিস্তান। আয়ুবশাহীর রাজত্ব। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল আয়ুবের লোকজন। পাকা ধান লুট করেছিল। যুবতী মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বেতনা নদীর ধারের গোটা গ্রামই রাতভর হেঁটে সাতক্ষীরে হয়ে ভোমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। বসিরহাটে উদ্বাস্তু শিবির, তারপর লরি ভর্তি করে

হাওড়া স্টেশনে চালান। সেখান থেকে ট্রেনে চাপিয়ে দণ্ডকারণ্য। সেই যে আয়ুব শাহীর আমলে মিছিল শুরু হয়েছিল, তা যেন চলছিল, থেমেছিল হাসনাবাদে এসে। যাদের আশ্বাসে এসে পৌঁছেছিল নিজদেশে, তারা তো মুখ ফিরিয়ে নিল। বুঝলে মাসি, কেউ ফিরেও তাকায়নি। তখন বসিরহাট থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত পথের ধারে, রেললাইনের ধারে, রেলস্টেশনে শুধু রিফিউজি। সরকার বেঁকে বসেছে। সুন্দরবনে ঢুকতে দেবে না, পুলিস এসে বলে গেল, ফেরত যাও, নদী পার হতে সরকারের বারণ আছে। ফেরত না গেলে ভেঙে দেওয়া হবে শিবির। রাতে চোখ রাঙিয়ে গেল কিছু লোক, গাঙ পেরুলিই মরবা, যেখেনে ছিলে সেখেনে ফেরত যা, এতই যদি তেল তবে এয়েছিলে কেন বর্ডার পেরিয়ে?

আমাদের হরিশবাবু এগিয়ে গিয়ে বলল, বাঁচতি এয়েছি, আপনার মুখ্যমন্ত্রীও ওদেশের লোক।

সে বড় ফেমিলি, চাষাভুসো পথের ভিখিরি না, তার নামে বললি জিব ছিঁড়ে দেব, যেখানে ছিলে সেখেনে কি মানুষ থাকে না।

তখন সকলে হৈ হৈ করে উঠেছিল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া জীবের মতো গর্জন করে উঠেছিল এক জোয়ান, না থাকে না, মালকানগিরি, দন্ডকারণ্যে থাকলি বুঝতে, জিব ছেড়বা, বাল ছেঁড়বা, আমরা সোন্দরবনে ঘর বাঁধবই বাঁধব, আর ফেরব না।

আমাদের সাহায্য করেন আপনারা, আমরা আপনাদের ভাই-বুন, বাপ-মা। এক বৃদ্ধ জোড় হস্তে দাঁড়িয়েছিল।

কেডায় সাহায্য করবে, পার্টি বলেছে হটিয়ে দিতি, তোমরা চলে যাও, থাকলে মরবা, যদি আগুন লাগে তোমাদের ছাউনিতে, কেউ বাঁচাবে না, মেয়েছেলে লুট হয়ে যাবে। শীর্ণকায় এক ধূর্ত বলে উঠেছিল।

কথাটা যেন আগুনেই ঘি ঢেলে দিল, হেই হেই করে উঠল জ্বলন্ত কয়েকটি চোখ। নিতাইহরির ছেলে বলাইহরি লাফ দিয়ে ধরল শীর্ণকায় লোকটির ঘাড়, এই কী বলতিছিস, মেয়েছেলে লুট করবি, আগুন দিবি ছাউনিতি, দেশটা তোর বাপের, জমিদারের বেটা জমিদার, চাষাভুসোরা মানুষ না, আমরা কি ভেসে এইচি?

তারা পালিয়েছিল। কিন্তু রাতভর কেউ ঘুমোয় না। ঠিক হলো নৌকো দখল করে নৌকো নিয়ে পাড়ি দিতে হবে অথৈ গাঙে। হরিশবাবু এখানকার নদীপথ চেনেন। তিনি ওপারের মানুষ, যখন দেশ অখন্ড ছিল তিনি নৌকো নিয়ে এদিকে কত এসেছেন। কুমিরমারিতে তাঁর বোনাইয়ের ভাই থাকে। ছোটমোল্লাখালিতে তাঁর পিসি থাকে। হরিশবাবু ছিলেন শহিদ ভাটা ক্যাম্পে। শহিদ ভাটা ক্যাম্প হলো মানা ভাটা ক্যাম্পের নাম। তখন বাংলায় পুনর্বাসনের দাবিতে সব ক্যাম্পে আন্দোলন চলছিল। আমরণ অনশনে বসেছিল উদ্বাস্তুরা। গুলি চলে কুরুদক্যাম্পে। মানা ভাটা ক্যাম্পে গুলিতে মারা যায় জনাদশ ব্যক্তি। সেই শহিদ ভাটা ক্যাম্পের হরিশবাবুর নেতৃত্বে শেষ রাতে নৌকো দখল করে মরিচঝাঁপি যাত্রা করেছিল লোকে। মাসি দেশের খোঁজে এয়েছিল তারা, কিন্তু সরকার বলল, ফিরে যেতে হবে, এদেশে কাউর জায়গা নেই। সরকার পুলিশ পাঠিয়ে মারতে লাগল। সরকার চাল গম ঢোকা বন্ধ করে দিল, না খাইয়ে মারবে উদ্বাস্তুদের। তাই হয়েছিল। গাঙের ভিতর রিফিউজি ভর্তি নৌকো ডুবিয়ে দিল সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে নৌকো ফুটো করে দিয়ে। মেয়ে-পুরুষ-শিশু সমেত নৌকো ডুবে গেল।

সুশান্ত বলে, যা জানতাম না, সব জেনেছি বহ্নিলতার কাছে, কেমন করে সব জানল বুঝতে পারি না।

হ্যাঁ, বহ্নিশিখা বলে, তার মেয়ে কেমন করে তাদের পূর্ব পুরুষের দেশ সেই এক গ্রাম যুগীপোতার কথা বলে। সব যেন তার চোখে দেখা। যখন বলে তখন শ্রোতাও দেখতে পায় সব। বহ্নিশিখা দেখতে পায় বেতনা নামের এক ছোট নদীর ঘাট সুপুরিঘাটাকে। নদীটা কোথা থেকে এসেছিল কে জানে, মিশেছিল কপোতাক্ষ নদে। একবার তার ঠাকুরদা জোয়ান নিতাইহরি মাটির হাঁড়িকুড়ি নিয়ে কপিলমুনিতে সংক্রান্তির মেলায় গিয়েছিল বেচাকেনা করতে। কপিলমুনি কপোতাক্ষ নদের ধারে এক গঞ্জ। কুমোরের চাক ছিল তাদের বাড়ি। তো সেই মেলাতেই দেখেছিল তার ঠাকমা যমুনারানিকে। যমুনার তখন বয়স কত এগার- বারো। লাল ডুরে শাড়ি পরে মায়ের সঙ্গে এসেছিল পৌষ সংক্রান্তির মেলায়। পছন্দ হলো তো যুবক সব জেনে নিল মেয়ের কাছে, বাড়ি কোথায় হলো, বাপের নাম কী? লক্ষ্মীর ঘট তুমি নিয়ে যাও। রঙিন লক্ষ্মীর ভান্ড পছন্দ করেছিল মেয়ে, এক পয়সা, ফুটো পয়সা, দুই পয়সা ফেলবে তাতে।

না, আর পয়সা নেই যে। মেয়ের মা বলেছিল। তারা হাতা কিনেছে, খুন্তি কিনেছে, এনামেলের সানকি কিনেছে, হাত খালি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, চোখের দেখা দেখছিল। যুবক নিতাইহরিও দেখল চোখের দেখা। মুখখানি কী শান্ত। চোখদুটি কিন্তু চঞ্চল। মায়ের হাত ছাড়িয়ে বেরোতে চাইছে, মা আঁকড়ে রাখছে মেয়েকে। হাত ছাড়ছেই না। সোমত্ত মেয়ে। রাখতে পারবে না কাছে তা জানে, তাই যেন বেশি করে ধরে রাখা। কিন্তু মেয়ের ভবিতব্য তো মানতে হবেই।

আমি এমনি দিচ্ছি, নি যাও মা, ওর পছন্দ হয়েছে যহন, নি যাও, লক্ষ্মীর ঘট, না করতি নেই। মেয়ের মা তো পুরুষের চোখ দেখে বুঝেছে। চোখে চোখে মিলেছে যে। লক্ষ্মীর ঘট মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে নিতাইহরি জিজ্ঞেস করেছিল, নামডা কী যেন খুকি?

খুকি না যমনা। বলে মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

আমি যুগীপোতা কদমতলিতে রই। বলে গুনগুন করে ওঠে নিতাইহরি, আমি তুমার বাড়িতি লোক পাঠাব, কোন গাঁ মা, মোর গাঁ যুগীপোতা, বেতনা গাঙের ধারে, মুরা আসলে পাল, কিন্তু চাষাবাদ এখন ভরসা, মুই তবুও গড়ি হাঁড়িকুড়ি, পোদীপ পিলসুজ, গেলাস বাটি, মাটির গাড়ি, মাটির পুতুল গড়ি।

বেশ বাবা, যাই। যমুনার মা মেয়েকে টানে। বেটাছেলে তার মেয়েতে মজেছে যে তা সে কি বোঝেনি? কিন্তু নিতাইহরির মুখখানি আর কথাটি যে বড় ভালো। যাই বলেও যমুনার মা যেতে পারে না।

ঘর কুথা হলো মা? নিতাই তো জানবেই, না জানলে পরের মাসে, মাঘ মাসে যমুনারানিকে নিয়ে নৌকোয় করে সুপুরিঘাটায় নামবে কী করে? গাঁয়ের নাম বলবে বলবে করে বলেনি মেয়ের মা। মেয়ে তো। কেন এত খোঁজ দেবে? গাঙের দিকে হাঁটছিল যমুনার মা যমুনাকে নিয়ে। নৌকোয় উঠতে পারলে বাঁচে। মেয়ের কত বুদ্ধি। মায়ের অজান্তে হাত বাঁকিয়ে দেখিয়ে দিল। বাঁকিয়ে দিয়ে বলে দিল, বাঁকায় ঘর। বাঁকা কপোতাক্ষর কুলে। নিতাইহরি ফিরতি পথে পরেরদিন বাঁকায় গিয়ে খোঁজ নিল এক গয়লা ঘোষের কাছে। ঘোষ ছানা নিয়ে গিয়েছিল কপিলমুনির বাজারে। বাঁকায় ঘর। যমুনা মেয়ের নাম। বাপের নাম ছিকান্ত দাস। বাপের নাম মেয়েই বলে দিয়েছিল তার মায়ের সামনে সে জিজ্ঞেস করায়। মা তো তাঁর পতির নাম ধরবেন না। ঘোষ বলেছিল, হুঁ, চিনবে না কেন, ছিকান্ত তাঁতির কথা বলছ, হাঁ বাঁকায় বাড়ি, বাঁকা ভবানীপুর।

তারপর? তারপর কী হলো?

হবে আবার কী, যমুনারানি শোলক বলে,

ছিকান্ত তাঁতি, আকা-বাঁকা বাড়ি,
মেয়ে তার পরিসে, লাল ডুরে শাড়ি।
অমুকহরি ছিরিহরি, যুগীপোতা ঘর,
সেই হরি হইলো যমুনার বর।
বেতনার ঢেউজল, কপোতাক্ষয় মিশে।
শুনা যায় ঘোষ ছিল যমুনার পিসে।

বহ্নিলতা রাতে মা বহ্নিশিখার সঙ্গে শুয়ে গুনগুন করে। শোয়ার পর একটি ঘণ্টা যায় শুধু কথায় কথায়। তার ঠাকমা যমুনারানি নিজের বিয়ে নিয়ে নিজেই শোক বানিয়েছে। বুড়ি পারেও বটে। স্বামীর নাম নেবে না, তাই নিতাইহরি হলো অমুকহরি। বুড়িই নাকি বলেছিল, একবার যখন সেই বিরামপুরা, মানা ক্যাম্প--- নরক থেকে আসতে পেরেছে, গাঙে ডুবে মরবে, তবু আর বিরামপুরা ফিরবে না। আর গাঙে ডুবে মরবেই বা কেন, ওপারে চলে যাবে, যুগীপোতা, বেতনার ঘাটে গিয়ে উঠবে। যমুনারানির বিবাহ বৃত্তান্ত বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে মেয়ে। বহ্নিশিখার ঘুম আসতে দেরি হয়। এতকাল বাদে জীবনের একটা মানে বোঝা যাচ্ছে। জীবন যেন শান্ত নদী, শান্ত বাতাস। শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি-- জীবন এমন হয় কত ঝড় কত ঝাপটা পেরিয়ে। কত পথ হেঁটে জীবন নদীর প্রমত্ততা কমে।

• চলবে...

একনজরে পশ্চিমবঙ্গ

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	কলকাতা
জেলা	৩০টি
প্রতিষ্ঠা	২৬ নভেম্বর, ১৯৫৬
সরকার	
• শাসক	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
• রাজ্যপাল	সিভি আনন্দ বোস
• মুখ্যমন্ত্রী	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)
• আইনসভা	বিধানসভা (২৯৫টি আসন)
• রাজ্যসভা	১৬টি আসন
• হাইকোর্ট	কলকাতা হাইকোর্ট
• প্রধান বিচারপতি	টি.এস. শিবজ্ঞানম
আয়তন	
• মোট	৮৮,৭৫২ বর্গকিমি (৩৪,২৬৭ বর্গমাইল)
জনসংখ্যা (২০২৩ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)	
• মোট	১০,২৫,৫২,৭৮৭
• ক্রম	৭ম
• ঘনত্ব	১,২০০/বর্গকিমি (৩,০০০/বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৮০.৮৬%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	IN-WB
সরকারি ভাষা	বাংলা ও ইংরেজি
ওয়েবসাইট	https://wb.gov.in

সিভি আনন্দ বোস
রাজ্যপাল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

পশ্চিমবঙ্গ

রাতুল হরিৎ

অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা বর্তমান প্রাদেশিক রাজধানী মানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। কোলকাতা একটি মেট্রোপলিটন শহর। পূর্ব ভারতে অবস্থিত দেশের চতুর্থ জনবহুল রাজ্য। জনবহুল এই রাজ্যটিকে সংস্কৃতির গলন পাত্র বা Melting pot of Cultures বিবেচনা করা হয়, সাংস্কৃতিক রাজধানীও বলা হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অসম ও সিকিম রাজ্য অবস্থিত। রাজ্যের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গঙ্গা পূর্বমুখে এবং গঙ্গাই পরবর্তীতে হুগলি নাম নিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে অবস্থিত শিলিগুড়ি করিডোর উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের সংযোগ রক্ষা করছে। পশ্চিমবঙ্গ একাধিক ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত

যেমন, দার্জিলিং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল, রাঢ় অঞ্চল, পশ্চিমের উচ্চভূমি ও মালভূমি অঞ্চল, উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল, সুন্দরবন এবং গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল। ২০২৩ সালের জনগণনা অনুযায়ী, এই রাজ্যের জনসংখ্যা ১০ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি। জনসংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য (প্রথম-উত্তর প্রদেশ, দ্বিতীয়-মহারাষ্ট্র, তৃতীয়-বিহার)। কলকাতা শহরটি ভারতের সপ্তম বৃহত্তম মহানগরী। এই রাজ্যের আয়তন ৮৮৭৫২ বর্গ কি. মি.। বাঙালিরাই এই রাজ্যের প্রধান জাতিগোষ্ঠী এবং রাজ্যের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বাঙালি হিন্দু।

ইতিহাস

ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। তখন ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশ বিভাজনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪টি জেলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। ১৯৫০ সালে পূর্বতন দেশীয় রাজ্য কোচবিহার জেলা রূপে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বতন ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর রাজ্যের হুগলি জেলার একটি অংশরূপে যুক্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তি ঘটে এবং বিহারের অপর একটি অংশ পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা ও জলপাইগুড়ি জেলার মতো বৃহদাকার জেলাগুলিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত: জলপাইগুড়ি বিভাগ, মালদহ বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, মেদিনীপুর বিভাগ।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা সংখ্যা মোট ৩০টি

১. কলকাতা (Kolkata) ২. হাওড়া (Howrah) ৩. হুগলী (Hooghly) ৪. নদিয়া (Nadia) ৫. মালদা (Malda) ৬. মুর্শিদাবাদ (Murshidabad) ৭. বাঁকুড়া (Bankura) ৮. বীরভূম (Birbhum) ৯. কোচবিহার (Cooch Behar) ১০. দক্ষিণ দিনাজপুর (Dakshin Dinajpur/ South Dinajpur) ১১. উত্তর ২৪ পরগনা (North 24 Parganas) ১২. দক্ষিণ ২৪ পরগনা (South 24 Parganas) ১৩. পশ্চিম মেদিনীপুর (Paschim Medinipur) ১৪. পশ্চিম বর্ধমান (Paschim Burdwan) ১৫. পূর্ব বর্ধমান (Purba Burdwan) ১৬. পূর্ব মেদিনীপুর (Purba Medinipur) ১৭. উত্তর দিনাজপুর (Uttar Dinajpur) ১৮. জলপাইগুড়ি (Jalpaiguri) ১৯. ঝাড়গ্রাম (Jhargram) ২০. কালিম্পং (Kalimpong) ২১. দার্জিলিং (Darjeeling) ২২. পুরুলিয়া (Purulia) ২৩. আলিপুরদুয়ার (Alipurduar) ২৪. সুন্দরবন (Sundarbans–নতুন জেলা) ২৫. ইছামতি (Ichamati নতুন জেলা) ২৬. বসিরহাট (Basirhat নতুন জেলা) ২৭. বহরমপুর (Berhampore নতুন জেলা) ২৮. রানাঘাট (Ranaghat নতুন জেলা) ২৯. বিষ্ণুপুর (Bishnupur নতুন জেলা) ৩০. কান্দি (Kandi নতুন জেলা)।

বিভাগগুলি বিভাগীয় কমিশনার ও জেলাগুলি জেলাশাসকের দ্বারা শাসিত হয়। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা কলকাতা জেলায় অবস্থিত। অন্যান্য জেলাগুলি মহকুমা ও ব্লকে বিভক্ত। এগুলি যথাক্রমে মহকুমা শাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দ্বারা শাসিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৪৬টি ব্লক রয়েছে। এই রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ত্রিস্তরীয়। গ্রামস্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 'গ্রাম পঞ্চায়েত', ব্লকস্তরে 'পঞ্চায়েত সমিতি' ও জেলাস্তরে 'জেলা পরিষদ নামে পরিচিত। ২০১৭ সালে বর্ধমান জেলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় পরিণত হয়েছে। এই সালেই ঘোষিত আরো দুটি জেলা হলো ঝাড়গ্রাম জেলা ও কালিম্পং জেলা।

কলকাতায় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক অবস্থান: কফি হাউস, কালীঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ভারতীয় জাদুঘর, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি, টিপু সুলতান মসজিদ, হাওড়া ব্রিজ, বেলুড় মঠ, মার্বেল প্রাসাদ, সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল, রাইটার্স বিল্ডিং, শহীদ মিনার, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জীবনধারা

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। এই সংস্কৃতির শিকড় নিহিত রয়েছে বাংলা সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক ও চলচ্চিত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মহাকাব্য ও পুরাণ-ভিত্তিক জনপ্রিয় সাহিত্য, সংগীত ও লোকনাট্যের ধারাটি প্রায় সাতশো বছরের পুরনো। উনিশ শতকে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা ছিল বাংলার নবজাগরণ ও হিন্দু সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র বাংলার প্রধান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে আজও অক্ষুণ্ণ। এই সময়েই চলচ্চিত্র পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। ১৯৫০-এর দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকের মতো চিত্র পরিচালকদের আবির্ভাব হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা লাভ করতে শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং জীবনধারার একটি অনন্য মিশ্রণ রয়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী বহু-জাতিগত এবং বহু-ভাষিক সংস্কৃতির সাথে, বিভিন্ন উৎসব যেমন বড়দিন, দুর্গাপূজা, ঈদ এবং অন্যান্য উৎসবগুলি সকলের দ্বারা সমান উৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জীবনান্দ দাশ প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ মাদার তেরেসা, সত্যজিৎ রায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, অমর্ত্য সেন এবং আরও অনেকের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গর্ব করে। বাংলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে ঠাকুর পরিবারের অবদান বাংলার রেনেসাঁকো ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ঠাকুর নিজেই ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান এবং বাংলার সাহিত্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন। তিনি শান্তিনিকেতন স্থাপন করেছিলেন যা এখনও দেশের সেরা উন্মুক্ত শিল্প ও সাহিত্য বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের' প্রধান শিল্পী এবং স্রষ্টা। ভারতের প্রথম একাডেমি পুরস্কার বিজয়ী সত্যজিৎ রায়–মস্কো, বার্লিন এবং সান ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানজনক পুরস্কার জিতেছিলেন। বিশ্বে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকদের একজন হিসেবে বিবেচিত। সত্যজিৎ রায় ৩২টি জাতীয় পুরস্কার জিতেছেন এবং চিরকালের জন্য ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। রাজা রাম মোহন রায় ছিলেন বাংলার সংস্কৃতি এবং শেষ পর্যন্ত বাকি ভারতের পরিবর্তনের অগ্রদূতদের একজন–তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং সতীদাহ প্রথা বাতিল করতে সাহায্য করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যক্তি যিনি ছেলের বিয়ের মধ্যদিয়ে বিধবা বিয়ে শুরু করেছিলেন যা বহু শতাব্দী আগে নিষিদ্ধ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বিপ্লবের পথপ্রদর্শক। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর 'জয় হিন্দ' এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম'-এর মতো স্লোগান সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং মুক্তি আন্দোলনকে আলোড়িত করেছিল। অবশেষে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' উভয়ই বাঙালি কবিদের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

কৃষি

পশ্চিমবঙ্গ একটি কৃষিপ্রধান রাজ্য। এই রাজ্যের জলবায়ু কৃষিকাজের জন্য

অত্যন্ত উপযোগী। কৃষিকাজ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। রাজ্যে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অনুকূল কৃষি-জলবায়ু রয়েছে। এই রাজ্যের মোট ফসলি এলাকা ৫২.০৫ লক্ষ হেক্টর যা ভৌগোলিক এলাকার ৬৮% এবং আবাদযোগ্য জমির ৯২% নিয়ে গঠিত। ফসলের তীব্রতা ১৮৪%। রাজ্যটি আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং বঙ্গোপসাগর কাছাকাছি হওয়ায় এটিকে প্রায়শই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়। এই রাজ্যে ধান, গম, পাট, শাক-সবজি, আলু, ডাল, তৈলবীজ এবং ভুট্টা উৎপাদন হয়।

পশ্চিমবঙ্গ দু-টি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত: দক্ষিণে গাঙ্গেয় সমভূমি এবং উত্তরে হিমালয় ও হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে তত্ত্বাবধান করে রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম।

পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো উত্তরবঙ্গের শৈল শহর দার্জিলিং, কালিম্পং, যেখান থেকে দেখা যায় সাদা বরফে ঢাকা হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা, মিরিক লেক, ডুয়ার্সের অভয় অরণ্য প্রভৃতি। দক্ষিণে রয়েছে সৈকতাবাস দীঘা, মন্দারমণি, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, গঙ্গাসাগর আর রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরবন। যেখানে গভীর অরণ্যে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পাণ্ডুয়া, বিষ্ণুপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ, স্মৃতিসৌধগুলি। স্থাপত্যশিল্প, টেরাকোটার সূক্ষ্ম কারুকার্য যে-কোনো ভ্রমণপিপাসুর মন ভরিয়ে দেয়। নয়ন ভোলানো এই রূপের কোনো তুলনা করা যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে গড়া শান্তিনিকেতন আশ্রম যা আজ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তা শুধু কবিতীর্থ নয়, অন্যতম ভ্রমণতীর্থও বটে। শান্তিনিকেতনের কাছে-পিঠে রয়েছে বক্রেশ্বর, তারাপীঠ। বীরভূম-পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়, মামা-ভাগ্নে পাহাড়, মুকুটমণিপুর, শুশুনিয়া পাহাড় প্রভৃতি ভ্রমণার্থীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এই সমস্ত ভ্রমণ কেন্দ্রগুলি ছাড়াও রয়েছে আমাদের মহানগরী রাজধানী কলকাতা। যেখানে রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বিড়লা তারামণ্ডল, পরেশনাথের মন্দির, সায়েন্সসিটি, হাওড়া ব্রিজ, দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কালীঘাটের কালী মন্দির, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, বেলুড় মঠ প্রভৃতি। কম খরচে, কম সময়ে, অনায়াসে বেরিয়ে এই সমস্ত স্থানগুলি দেখে নেওয়া যায়।

কালিম্পং

কালিম্পং শহরটি একটি শৃঙ্গের উপর অবস্থিত, শহরের চারপাশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং পর্যটন স্থানগুলির জন্য এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। অনেক ফুলের নার্সারির বাড়ি, এটি উদ্যানপালন গাছের চাষের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এর কোলাহলপূর্ণ বাজার, বৌদ্ধ মঠ, ঔপনিবেশিক যুগের স্থাপত্য এবং হিমালয়ের কিছু সেরা দৃশ্যের সাথে, কালিম্পং শহরটি অবশ্যই পরিদর্শন করা উচিত। খাবারের দৃশ্যে বাংলা, তিব্বতি এবং চাইনিজ খাবারের প্রাধান্য রয়েছে।

রিশপ রিম্বিক

কালিম্পং এলাকায় অবস্থিত, রিশপ রিম্বিক একটি মধ্যযুগীয় মনোমুগ্ধকর দেহাতি সরলতা প্রকাশ করে। অনেক ট্র্যাকের শেষে, রিম্বিককে নির্জনতা কামনা করার জন্য একটি গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। শুধু ট্রেকারদের জন্য, রিম্বিক বার্চ, ফার এবং পাইনের বনে বাস করে এবং রাস্তা দিয়ে কার্যত দুর্গম। ছোট কুটির বাসস্থান এবং হিমালয়ের চমৎকার দৃশ্যের সাথে এটি শান্তি এবং নির্জনতার জন্য আদর্শ স্থান।

লাভা লোলেগাঁও

সচিত্র পাইন বন দ্বারা বেষ্টিত একটি ছোট এবং শান্তিপূর্ণ গ্রাম, লাভা লোলেগাঁও প্রায়ই কুয়াশা এবং মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। লাভা লোলেগাঁও প্রকৃতি অন্বেষণ এবং পাখি পর্যবেক্ষণের জন্য জনপ্রিয়। এর সবচেয়ে জনপ্রিয় আকর্ষণ হলো ক্যানোপিউত এর ওয়াক, একটি ১৮০ মিটার ঝুলন্ত কাঠের গাছের উপরের সেতু যা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যায়। ভুটানি বংশোদ্ভূত সুন্দর মঠের আবাসস্থল, লাভা লোলেগাঁও শান্তি ও বিশ্রামের জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য।

মিরিক

দার্জিলিং জেলার নিরিবিলি পাহাড়ে অবস্থিত, মিরিক হলো একটি আন্ডাররেটেড প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গা। মিরিকের আকর্ষণ সুমেন্দু হ্রদে রয়েছে যা শহরের মধ্য দিয়ে গেছে। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত, বোকার মঠের সামনের দিকে একটি সোনালি বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। এর সুন্দর পরিবেশের সাথে, মিরিক একটি ক্লাসিক গন্তব্য।

সান্দাকফু

ট্রেকারদের জন্য একটি বিস্ময়কর জায়গা, সান্দাকফু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। বিশ্বের ৫টি সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মধ্যে ৪টির স্মারক দৃশ্যসহ, সান্দাকফু হলো ট্রেকারদের জন্য সবচেয়ে বেশি যাওয়া গন্তব্য। এখানে রয়েছে একটি বিশাল জাতীয় উদ্যান আর কিছু বিরল প্রাণীর সমাহার।

সমুদ্র সৈকত

বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি একটি আদর্শ সমুদ্র সৈকত। এই সৈকত দৈনন্দিন জীবনের তাড়াহুড়ো থেকে আমাদের শান্ত হতে এবং চাপমুক্ত করতে সহায়তা করে। এই সুন্দর গন্তব্যস্থলগুলি শান্তির জন্য উপযুক্ত জায়গা।

দীঘা

দীঘা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম এবং জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকত শহরগুলির মধ্যে একটি। দীঘা উপকূলরেখার সেরা যাত্রার গন্তব্য হিসেবে পরিচিত। এখানে আরও রয়েছে ধর্মীয় মন্দির, গবেষণা কেন্দ্র, জাদুঘর, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, নির্জন এলাকা, বাজার, বিলাসবহুল রিসোর্ট। আবার বিভিন্ন মূল্যের হোটেলও পাওয়া যায়। সমস্ত রিসোর্ট এবং হোটেল সেরা বাঙালি এবং সামুদ্রিক খাবারের রন্ধনপ্রণালী অফার করে।

মন্দারমণি

ভারতের সবচেয়ে পূর্ব উপকূলের সৈকতগুলির মধ্যে একটি। কলকাতার মূল শহর থেকে মাত্র ১৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মন্দারমণি গত দশকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটি অত্যাধুনিক রিসোর্ট এবং ভালো পরিষেবা এবং সূক্ষ্ম রন্ধনপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। মন্দারমণিকে আপনার সৈকত ভ্রমণের তালিকার শীর্ষে রাখা যায়।

শংকরপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত। শান্ত ছোট শহর পর্যটকদের আনন্দের পরিবেশ দেয়। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। শঙ্করপুর খুব কম লোকের কাছে পরিচিত এবং কম লোকই পরিদর্শন করে। এর আদিম সৈকতগুলি সীমাহীন শান্ত। গ্রামগুলি নিকটবর্তী।

তাজপুর

নির্জন সৈকত তাজপুর কলকাতা থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মন্দারমণি এবং শঙ্করপুরের মধ্যে অবস্থিত। এখানে মাছ চাষের

জন্য উৎসর্গীকৃত একর একর জমি রয়েছে। একটি পরিচ্ছন্ন সৈকত যা লাল কাঁকড়ার প্রাচুর্যের জন্য সুপরিচিত। পর্যটকরা এই অঞ্চলের আশেপাশে এবং সমুদ্র সৈকতে বসবাসকারী জেলেদের সাথে দেখা করতে এবং তাদের জীবন উপভোগ করতে পারেন। পর্যটন দৃশ্যে একটি অপেক্ষাকৃত নতুন স্থান। তাজপুরে অন্যান্য সৈকত রিসোর্টের তুলনায় কম হোটেল রয়েছে।

বকখালি

বকখালি একটি আকর্ষণীয় সমুদ্র সৈকত। বকখালি এলাকার আশেপাশে কয়েকটি মন্দির আর এক ধরনের কুমির প্রজনন কেন্দ্র আছে। বকখালি একটি আন্ডাররেটেড পর্যটন গন্তব্য। নির্জন সৈকত এবং ম্যানগ্রোভ গাছে ভরা এই দ্বীপটি পর্যটকদের জন্য এক বিস্ময়। আপনার যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সজ্জিত একটি শহর।

সংস্কৃতি

অনেক পুরনো একটা সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনধারা সমগ্র জাতির ইতিহাসকে সম্পর্কিত করে। ভ্রমণ উৎসাহীদের জন্য বিভিন্ন ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম, রন্ধনপ্রণালী এবং জীবনধারার সংমিশ্রণ পশ্চিমবঙ্গ পাওয়া যায়।

গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর একটি তীর্থস্থান হিসেবে সম্মানিত। লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রতি বছর এই পবিত্র জলে ডুব দিতে সমবেত হন। জমকালো রূপালী বালি এবং শান্ত সমুদ্র অ-তীর্থযাত্রীদেরও ডাকে।

বেলুড় মঠ

বেলুড় মঠ একটি মন্দির যা হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং ইসলামিক মোটিফগুলি সমস্ত ধর্মের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে প্রদর্শনের জন্য উল্লেখযোগ্য। এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো এই মন্দিরটি মানবতার সার্বিক কল্যাণে আধুনিক চিন্তাধারা প্রচার করে চলছে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির

বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি দেবী কালীর গর্ভগৃহ হওয়ার জন্য সম্মানিত। সবচেয়ে শক্তিশালী হিন্দু দেবী আত্মাদের মুক্তির জন্য পরিচিত। এই বৃহৎ মন্দির কমপ্লেক্সে ১২টি মন্দির বা উপাসনালয় আছে

কালীঘাট

কালীঘাটের কালী মন্দির কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মীয় আকর্ষণ। হিন্দু সতী দেবীর শরীরের বিভিন্ন অংশ, পতিত স্থান বলে বিশ্বাস করা হয়।

তারাপীঠ

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি ছোট মন্দির শহর তারাপীঠ একটি তান্ত্রিক মন্দির এবং সংলগ্ন শ্মশানের জন্য পরিচিত। যেখানে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান করা হয়। তান্ত্রিক হিন্দু মন্দিরটি দেবী তারাকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

নদীয়া জেলা

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম জেলাগুলির মধ্যে একটি। প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র, নদীয়া রাজ্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর প্রাচীন মন্দির, ঐতিহাসিক দুর্গ এবং মসজিদ এটিকে একটি পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করেছে। কিন্তু এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধের ময়দান।

ব্যান্ডেল

ব্যান্ডেল চার্চ এই অঞ্চলে পর্তুগিজ শাসনের একমাত্র স্মারক। ব্যান্ডেল চার্চটি এই অঞ্চলের গৌরবময় অতীতকে চিত্রিত করে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বিশাল ধর্মীয় স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরি করা হয়েছিল।

নাখোদা মসজিদ

নাখোদা মসজিদকে কলকাতা শহরের প্রধান মসজিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে একসঙ্গে হাজার ভক্ত প্রার্থনা করতে পারে। মসজিদের অভ্যন্তরে চমৎকার অলঙ্করণ রয়েছে।

ফুরফুরা শরিফ

সাধারণভাবে ফুরফুরা নামে পরিচিত মুসলিম তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি পবিত্র স্থান। ১৩৭৫ সালে নির্মিত প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে অন্যতম এটি।

নিজামত ইমামবাড়া

নিজামত ইমামবাড়া হল মুর্শিদাবাদে নির্মিত একটি শিয়া মুসলিম ধর্মসভা হল। এটি ভারতের বৃহত্তম ইমামবাড়া। মূলত সিরাজউদ-দৌলার শাসনামলে ২৫০ বছরেরও বেশি আগে নির্মিত।

সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল

সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল হল কলকাতার অ্যাংলিকান পটভূমির একটি গির্জা। এটি গথিক স্থাপত্যের জন্য বিশিষ্ট। ১৮৪৭ সালে নির্মিত এটি কলকাতার বৃহত্তম ক্যাথেড্রাল এবং এশিয়ার প্রথম এপিস্কোপাল চার্চ।

মায়াপুর

মায়াপুর বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারীদের জন্য বৃহত্তম তীর্থস্থানগুলির মধ্যে একটি। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত। মায়াপুর প্রতি বছর এক মিলিয়নেরও বেশি তীর্থযাত্রী যায়। মায়াপুর বিশ্বমঞ্চে ইসকন (কৃষ্ণ চেতনার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ) এর বিশ্ব সদর দপ্তর হিসেবেও পরিচিত।

হিমালয়ের ঢাল থেকে গঙ্গার মুখে ব-দ্বীপ পর্যন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে সমৃদ্ধ এলাকা। এই এলাকার ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম প্রধান ইকো-পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। নদীপথের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসহ, দক্ষিণবঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চল বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত। ডোয়ার্স, জলদাপাড়া, গোরুমারা জাতীয় উদ্যান, সুন্দরবন, পাখির অভয়ারণ্য, নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক, বক্সা টাইগার রিজার্ভ ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক স্থান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক অতীতে ভরপুর। শিল্পী, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ইতিহাস ভক্তদের জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য। মহিমান্বিত দুর্গ এবং মহৎ মন্দিরে পরিপূর্ণ। ইতিহাসের বৃহত্তর অংশ ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত, বাংলা রোম্যান্স, বর্বরতা, যুদ্ধ এবং বীরত্বের গল্পে ভরা। ভ্রমণকারী এবং পর্যটকদের জন্য বাংলা একটি মুগ্ধকর ভ্রমণ হতে পারে। ঘুরে দেখতে পারেন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চল। •

রাতুল হরিৎ
প্রাবন্ধিক

আপনার মতামত জানান
যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯
এক্সটেনশন : ১১৪২
inf2.dhaka@mea.gov.in
ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

ভারতের ডুয়ার্সের আট জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পূজা-পার্বণ

অম্বরীশ ঘোষ

লোকসংস্কৃতি

ভাষা, হরফ, বর্ণমালা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পরিধান নিয়ে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স জুড়ে বসবাস করে আসছেন নানান জনজাতি। ডুয়ার্সকে এই জন্য মিনি ভারতবর্ষও বলা হয়। নিজ নিজ অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্রমবিবর্তনের অধ্যায়কে এরা সমৃদ্ধ করে চলেছে। প্রকৃতির মধ্যে থেকে যুগের পর যুগ ধরে এরা খুঁজে চলেছে জীবনীশক্তি। প্রকৃতি এদের দেবতা, এদের যাপন-সম্বল। জীবন ও জীবিকার জন্য এরা আঁকড়ে ধরে অরণ্যকে, লেপ্টে থাকে নদীতে, ভূমি ধূসরিত অরণ্যপথে ধামসা-মাদল বাজিয়ে গেয়ে চলে জীবনের জয়গান। নানান ঋতুতে নানান উপলক্ষকে সামনে রেখে নানান ধর্মীয় আচার-আচরণে শান্তি ও সমৃদ্ধি খুঁজে ফেরে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রকৃতি সন্তুষ্ট থাকলে এবং পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ মাথায় থাকলে একটি সুন্দর যাপনরেখায় জীবনের সংজ্ঞা সাজিয়ে তোলা সম্ভব। এই প্রাপ্তিটুকুর জন্য বছরের নানান সময়ে নানান উৎসবে মেতে থাকে এরা

রাক্ষস, যক্ষ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতো একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ অসুর। বৈদিক যুগে বেদকে সম্মান করে যারা যজ্ঞ করত, তারা সুপরিচিত হলেন 'দেব' হিসেবে। আর উল্টোটা হলো যারা এই যজ্ঞাদি করত না; তারাই পরিচিত হলো 'অসুর' নামে। বৈদিক যুগের শেষ দিকে দেব আর অসুরদের তিক্ত সম্পর্কে যুদ্ধ বাঁধে। অসুররা পরাজিত হলে এদের মান্যতার ওপর প্রভাব পড়ে। কিন্তু সাহস-বল-বুদ্ধি প্রভৃতির জন্য এরা পরবর্তীতে আলোচ্য হয়ে ওঠে। শঙ্করাচার্যও এদের প্রশংসা করেছেন। মূল ধারার বাইরে এদের পূজা-আর্চ্চা। এই সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূজা হলো হাঁড়িয়াড়ি পূজা। একটি অসুর পরিবারে এপ্রিল-মে মাসের দিকে এই পূজা আয়োজিত হয়। বিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব যার জন্য আছে, সেই প্রকৃতিই পূজিতা হন এই পূজায়। নদী-নালা-গাছ-বীজ-অরণ্য-খেত এই পূজা পেয়ে থাকেন অসুরদের থেকে। ঘরের ভেতরে আয়োজিত হয় এই পূজা। খেতে উৎপাদিত প্রথম ফলমূল ও শাকসবজি উৎসর্গ করা হয় পূজাতে। এই পূজাটি না করে অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন উৎপাদিত ফল ও সবজি খায় না। পূজার আগে গোবর দিয়ে পূজাস্থল লেপে নেওয়া হয়। নিবেদিত ফল ও সবজিগুলোকে কলাপাতা কেটে ও ধুয়ে তার ওপর রাখা হয়। বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষরা পূজা করে। বিশেষভাবে নির্মিত হাঁড়িয়া বা তাপবান ঘটি কিংবা গ্লাসে উৎসর্গ করা হয়। মুরগিও উৎসর্গ করা হয়, তবে ডিম পাড়া মুরগি ব্যবহৃত হয় না। মুরগিটিকে বলি দিয়ে রক্ত দেওয়া হয় পূজাস্থানে। পূজাতে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিকের বন্দনা করা হয়। তেল ও সিঁদুর ব্যবহৃত হয় এই পূজাতে। পূজা শেষে তা একসাথে মিশিয়ে ঘরের নানা স্থানে মাঙ্গলিক ফোঁটা দেওয়া হয়। বলি দেওয়া মুরগিটি হয় খিচুড়ি নয়তো তরিতরকারিতে দিয়ে রান্না হয়। পরিবেশিত হয় প্রসাদ হিসেবে।

ইন্দো-মঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত প্রাচীন জাতি মেচদের মাইব্রামদাই পূজাটিও বেশ স্বতন্ত্র। সাধারণত অগ্রহায়ন মাসে ধান পাকার সময় ধানের মাঠেই আয়োজিত হয় পূজাটি। তবে কেউ কেউ ধানের মাঠ ছাড়াও গোলা বা খোলানের সামনে পূজাটি করেন। ধানের মাঠে হলে মাঠের উত্তর দিকে পূজাটি হয়। কাস্তে দিয়ে পাকা ধানের থেকে কিছুটা কেটে তাকে আঁটির মতন বাঁধা হয় এবং দেবীরূপে পূজা করা হয়। শাড়ি-মালা পরানো হয়। দূর্বা, তুলসী বা তুরুৎসী পাতা, কড়ি ও খাওভৈ, পায়েসের ভোগ বা দুদুংখাম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পূজার স্থানেই হাঁস, বা পায়রা বা মুরগি বলি দেওয়া হয়। বলির আগে তুলসী পাতার ভালো দিয়ে তার মাথায় জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। জল ছেটানোর পর পাখিটির মাথা ঝাঁকানোকে বলির উপযুক্ত সময় হিসেবে মানা হয়। বলির পর দেবতার সামনে রাখা কলার ডোঙা বা ভোমের ওপর বলিপ্রদত্ত জীবের মাথা রাখা হয়। কেউ কেউ পৃথকভাবে রক্তও ঢেলে দেয়। চার-পাঁচটি ডোঙার মধ্যে কোনোটাতে রান্না করা ভোগ, কোনোটাতে ধূপ প্রভৃতি দেওয়া হয়। অন্যান্য দেবতার মধ্যে সূর্যের দেবতা সানজান ব্রালি, বৃষ্টির দেবতা আখ্রাং মদাই, বাতাসের দেবতা কৈলা প্রমুখদেরও স্মরণ করা হয়। বলি দেওয়া পাখিটির মাংস খোলা আকাশের নিচেই রান্না হয়। চাল, মাংস, মসলাপাতি দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে এই রান্না করা হয়। করা, আতপ চাল, পানসুপারি, গুড় বা বাতাসা, চিড়ে, কাঁচা দুধও এই পূজার উপকরণ। পূজা শেষে পুরোহিত এবং তার সহকারী, যাকে পান্তোল বলা হয়, গৃহে এসে মাংস, হাঁড়িয়া বা জুমাই দিয়ে আহার করেন। পাড়া-প্রতিবেশী বা গামিনি মানসীও নিমন্ত্রিত থাকে এবং তারাও ভোজে অংশ নেয়।

লিম্বু সমাজেও সারা বছর নানান পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে উদৌলী-উবৌলী পূজা গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড়ি নদীতে মাছের ওপরে ওঠা ও স্রোত বেয়ে নিচে নামাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় পূজাটি। বৈশাখের সময় মাছ ওপরে উঠে যায় এবং আয়োজিত হয় উবৌলী পূজা। আবার আশ্বিনের সময় মাছ নিচে নেমে আসে এবং আয়োজিত হয় উদৌলী পূজা। প্রকৃতিপ্রেমী ও প্রকৃতির উপাসক লিম্বুরা মাছকে প্রকৃতির উপাদান হিসেবে গণ্য করে এবং নদীর ধারেই এই পূজা আয়োজিত হয়। পুরোহিত বা ফ্যাদাংমা পূজাস্থানে ছয়টি ছোট ছোট বাঁশের চোঙ বা তংবা ব্যবহার করেন। তংবার ওপর একটি করে পিপসিং বা স্ট্র রাখা থাকে। কাঁসার থালা বা কলাপাতার ওপর রাখা হয় আধ কেজি আতপ চাল। এই চালকে একদিকে নয়টি ভাগ করে এবং অপরদিকে এক ভাগ করে রাখা হয়। নয়ভাগের দিকে রাখা হয় একটি মুরগির ডিম, একটি লাল মোরগা এবং সাদা-কালো বাদে যে কোনো রঙের মুরগি। অপরদিকে একভাগ চালের দিকে রাখা হয় একটি কালো রঙের মুরগি। এই কালো মুরগিটি বনের দেবতা মিসেককে উৎসর্গ করা হয়। শালের ধূপ, আদা প্রভৃতি অপরিহার্য এই পূজাতে। কাঁসার কলসে রাখা হয় কাঁচা তিতেপাতি নামক ঔষধী ডাল। সাতজোড়া ছোট মাছ ব্যবহৃত হয় পূজাতে। পূজার দিনই ধরা হয় মাছগুলোকে। তবে জিয়ল মাছকে বর্জন করা হয়। জল দিয়ে সেদ্ধ মাছ অর্পণ করা হয় কলাপাতায়। পূর্ব পুরুষদের আচার নিয়মের প্রতি অনুগত লিম্বুরা এভাবেই সম্পন্ন করে পূজাটি।

গারো জনগোষ্ঠীর মানুষেরা কৃষিভিত্তিক একটি ধর্মে বিশ্বাসী, যার নাম সাংসারেক। গারোদের নানা পূজাপার্বণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাতরা-সুসমি পূজা। যেই ঈশ্বর-প্রতীকী অবয়বকে পূজা করা হয়, তার নির্মাণে প্রথমে বাঁশকে কেটে ছুঁলে বাতা বের করা হয়। বাতাগুলোকে গোড়ায় একস্থানে বেঁধে ওপরে প্রসারিত করা হয়। একদম ওপরের অংশ আবার বাঁশ দিয়ে বুননের মতো করে বেঁধে দেওয়া হয়। অন্যান্য নানা গাছের অংশ কেটে সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার এই প্রতীকী অবয়ব তৈরির ক্ষেত্রে বাঁশ ছুঁলে ফুলের মতো আকৃতিও দেওয়া হয়। জঙ্গল-অরণ্য প্রধান জীবনযাপনে জমি-জঙ্গলের পাশেই পূজাটির আয়োজন হয়। পুরোহিত বা খামাল পূজা সম্পন্ন করেন। পরিধান করেন কটিবস্ত্র। জোগাড়যন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে আধঘণ্টা বা একঘণ্টা সময় লাগে তার। উপকরণ হিসেবে মুখ্যত থাকে হাঁড়িয়া। দা বা মুল্লাম দিয়ে খামাল মুরগি বলি দেন। বলির রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় পূজাস্থলে। খামাল মুখভর্তি হাঁড়িয়া নিয়ে ছিটিয়ে দেন প্রতীকী মূর্তির গায়ে। এই স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে তিনি প্রতীকী মূর্তিতে স্নান করিয়ে দেন। হাঁড়িয়া উৎসর্গ করা হয় বৃহৎ পিঁপাতে। উৎসর্গ করা হয় গোটা কাঁচা সুপারি ও পান। পূজাতে অগ্নি-সূর্য-জল-হাওয়া সকলকেই স্মরণ করা হয়। উৎপাদিত নতুন ফসলের অংশবিশেষ রাখা হয় প্রতীকী মূর্তির সামনে। পূজার উপকরণ হিসেবে চালের গুঁড়ো ও গন্ধপাতা একসাথে পেষা হয়। এই পেষা মিশ্রণ মাংস কষাতেও ব্যবহৃত হয়। বিচিকলার গাছ পোড়ানো খাওয়ার সোডাও মেশানো হয় এতে। পূজা সম্পন্ন হবার পর পূজাস্থানের একটু দূরেই ভাত, মাংস খাওয়ার রেওয়াজ আছে এদের।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ ওরাঁওরা প্রভৃতি উপাসক। নানান পূজা-অর্চনার মধ্যে দিয়ে ভান্ডারেংনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পূজা। চলতি ভাষায় একে ভাগকাটিও বলা হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ পঞ্চভূত যাতে সন্তুষ্ট থাকে, সেজন্য এই পূজা আয়োজিত হয়। সাদা রঙের ডিমকে মাঝে রেখে তাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় পূজাটি। ডিম্বাকৃতি পৃথিবীর আকৃতির কথা মাথায় রেখেই ডিমের ব্যবহার করতেন এদের পূর্বপুরুষরা–এই ধারণাও রয়েছে এদের মনে। ডিমকে মাঝে রেখে মুখ্যত পাঁচটি রঙ দিয়ে চিত্রণ বা সাজসজ্জা করা হয়। ডিমের মাথায় নির্দিষ্ট রীতিতে রাখা হয় ঔষধি গাছের ডাল চিরচিটটি। সামনে বিশেষ আকারের কুলোর মধ্যে পরিমাণগত আতপ চাল এবং চিরচিটটি গাছের ডালের সাতটি টুকরো রাখা হয়। পূজা শেষে কিন্তু এই সাতটি ডাল নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ছড়িয়ে ফেলে বোঝা হয় যে পূজা ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা! যাই হোক, দীর্ঘ সময় লাগে এই পূজাতে। পূজাতে নির্দিষ্ট মন্ত্রাদি বাদেও রাম লক্ষণের কাহিনি, সীতার বনবাস কথা, সীতাহরণ অধ্যায়, হনুমানের লঙ্কাভ্রমণ ও লঙ্কাকাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন

পুরোহিত বা দেউসি। কখনো মহাদেবের কাহিনিও শোনান। কাহিনি শোনার সময় শ্রোতাদের নানাভাবে দেউসির গল্পে সাড়া দিতে হয়। পূজা শেষে গ্লাসে থাকা হাঁড়িয়া পঞ্চভূতের নামে ডিমের ওপর ঢালা হয়। মনুয়া কলার পাতায় ডিমটি ফাটিয়ে অল্প ব্যবহৃত আতপচাল মিশিয়ে আগুনে সেদ্ধ করা হয়। এটাই মূল প্রসাদ, সাথে হাঁড়িয়া। মূল প্রসাদ গ্রহণ শেষে ডাল, ভাত, সবজিও পরিবেশিত হয়।

বিশুদ্ধ প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর বলিষ্ঠ সাঁওতালরা বেশ জাঁকজমকের সাথে নিজেদের অনুষ্ঠানগুলো পালন করে। পালিত উৎসবগুলোর মধ্যে একটি হলো বাহাবঙ্গা। 'বাহা' মানে ফুল আর 'বঙ্গা' মানে পূজা। ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার ঠিক পরপর এই উৎসব পালিত হয়। সমাজের সকলে মিলে পূজার স্থান নির্বাচন করেন এরা। আগের দিন ও পূজার দিন সকালে গোবর দিয়ে লেপে নেওয়া হয় এই স্থানটি। তবে লেপে নেবার আগেই সাড়ে পাঁচ বা ছয় ফুট উঁচু অস্থায়ী মণ্ডপ বা জাহের বুটা তৈরি করা হয় বাঁশ ও খড় দিয়ে। লাল মোরগ, শালের ফুল, দিয়া সুতো, পানপাতা, কাঁচা সুপারি, ধূপকাঠি, আদবাচাউলে বা আতপচাল, বাতাসা, কলা, নকুলদানা প্রভৃতি এই পূজার উপকরণ। শালের ফুল অনেকটা পরিমাণ দরকার হয়। সবাই কানে গুঁজে নেয় এই ফুল। নানানভাবে সাজসজ্জাতেও এই ফুলটি ব্যবহৃত হয়। পূজার স্থানে চারটি খোপ খোপ নকশা আঁকা হয়। প্রতিটি খোপে অল্প অল্প করে চাল ও হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। এই খোপগুলো বানানো হয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। পুরোহিত বা মনজিহারাম এবং তার স্ত্রী মনজিবুড়ি সমস্ত পূজাপদ্ধতির নির্দেশদান ও সম্পাদন করেন সকলের সহযোগিতায়। মোরগ আর চাল দিয়ে খিচুড়ি অথবা দুধভাত বা তোয়াদাক্কা অন্যতম প্রধান প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয় পূজাশেষে।

ডুকপা জনগোষ্ঠীর নানান পূজা পার্বণ বুদ্ধকে কেন্দ্র করে, প্রকৃতির ওপর এদের গভীর আস্থা ও ভরসা। গেবত এদের একটি বিশেষ পূজা যা বুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে করা হয়। নিজ নিজ ঘরেই ডুকপারা এই পূজার আয়োজন করে থাকেন। পূজারি লামা বা ছোব্-কে অনুরোধ করা হয় পূজার জন্য। আয়োজক গৃহের নির্দিষ্ট পূজাকক্ষের তাক বা ছৌসমের ওপর পূজার আরাধ্য দেবতা বুদ্ধকে রাখা হয়। বুদ্ধ মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। ছোব্ নিজে হাতে তৈরি করেন মূর্তিটি। মাড়োয়ার আটা দিয়ে তৈরি হয় মূর্তিটি। মূর্তির সামনে কলার ডোম, বাঁশের কাঠি ও নানান রঙের সুতো দিয়ে পবিত্র প্রতীক বানানো হয়। প্রধান প্রতীকী মূর্তি বাদে আশপাশে অন্য মূর্তিও বানানো হয়, তবে ছোট আকৃতির। মূর্তির সামনে জ্বলে দিয়া বা কামি, জ্বালানো হয় ধূপকাঠি বা পি। নানা মাঙ্গলিক ও প্রথাগত বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিমণ্ডল। সময়ে সময়ে বাজানো হয় লম্বা চোঙ সদৃশ বাদ্যযন্ত্র বা ধূ, দ্রোয়েম, কাদু প্রভৃতি। দেবতার সামনে চৈন্ত বা মোড়ার ওপর নিবেদন করা হয় আপেল, আঙুর, কলা, ভুট্টা, কুকিস, টোস্ট, বিস্কুট প্রভৃতি। রাচু পরিহিতা মহিলারা একসাথে সাতবার করে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন পূজার সামনের ভূমিতে। দিনের মধ্যে বহুবার এই ভক্তিভরে মাথা ঠেকানো চলে। পরিবারের রোগমুক্তি, শান্তি-

শৃঙ্খলা-স্বচ্ছন্দ প্রভৃতি নানা বিষয়কে সামনে রেখে পূজাটি আয়োজিত হয়।

মুণ্ডারি ভাষাভাষীর মানুষ মুণ্ডারা বনভূমির বুকে স্বতন্ত্র, দক্ষ এবং চা-শ্রমিক হিসেবেও বিশেষ নির্ভরযোগ্য। মুণ্ডা সমাজ সারা বছর অপেক্ষা করে লসের পূজার জন্য। কবিরাজ বা ওঝা বাঁশের লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে ঠোকাতে ঠোকাতে ইতিউতি হাঁটতে শুরু করেন। যে স্থান তাকে ইঙ্গিত দেবে, সেই স্থানেই পূজা হবে। প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই পূজা হয়। নিবেদন করা হয় ফলমূল, শাক-সবজি প্রভৃতি। সেদ্ধ করা ভাজা চাল বা চালফুঞ্জা, ভেজে নেওয়া গোটা কলাই ডাল, রশিদা বা বিশেষ হাঁড়িয়া প্রভৃতিও উৎসর্গ করা হয়। মুরগিও এই পূজাতে অত্যাবশ্যকীয়। সাদা-কালো রঙের মুরগি তিরের ফলা দিয়ে অর্ধেক গলা কেটে রাখা হয়। তার রক্ত উৎসর্গ করা হয় দেবতাকে। ধাপে ধাপে তিনটি মুরগি উৎসর্গ করা হয়। পূজা শেষে দড়ি বা বাঁধা ধনুকের সামনের দিকে উৎসর্গ করা মুরগি ও পেছনের দিকে মুরগির খাঁচা বেঁধে নিয়ে আসা হয় পূজাস্থল থেকে বাড়িতে। কলিজা ও লম্বা বড় নালিটা কেটে নিয়ে যাওয়া হয় পৃথক পূজা ঘরে। সেদ্ধ করা হয় এই কলিজা ও নালি। অন্যদিকে বাইরের একটি জায়গা তিন বা চারকোনা করে ঘিরে রাখা হয়। সেখানে রান্না হয় মুরগিগুলো। বাইরের পূজার অংশ সম্পন্ন হতে আধঘণ্টা ও বাড়ির ভেতরের পূজা সম্পন্ন করতে সময় লাগে দশ-পনেরো মিনিট। অত্যন্ত পবিত্র এই পূজায় হাওয়া-পানি-আন্ধি-তুফান ও বড়ামবুড়িকে সন্তুষ্ট হতে অনুরাধ করেন তারা। মুণ্ডাদের বিশ্বাস যে এই পূজা না করলে তাদের অস্তিত্বই থাকবে না।

অম্বরীশ ঘোষ
কবি ও গবেষক

এভাবেই ডুয়ার্সে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নিখুঁতভাবে, সব প্রচলিত নিয়মকানুনকে মেনে মেতে ওঠে উৎসবে, আনন্দে লিপ্ত থাকে পূজায়। নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বুকে আগলে কালের প্রবাহে এগিয়ে চলে তারা। •

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ
ভারত বিচিত্রা
লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। –সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....
Address :..... Bank Account Name :.....
..... Account No :.....
..... Bank Name :.....
Phone/Mobile :..... Branch Name :.....
e-mail :..... Routing No :.....

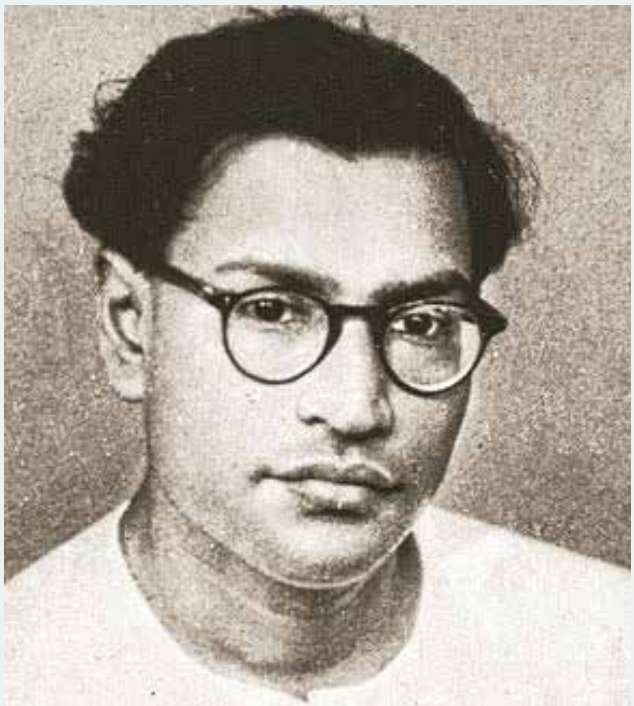

জন্ম : ৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ • মৃত্যু : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

সুখ-দুঃখের লেখক
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ফরিদুজ্জামান

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর', অগ্রগামীর 'হেডমাস্টার', 'বিলম্বিত লয়'; রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক', 'রস' গল্প অবলম্বনে অমিতাভ বচ্চন অভিনীত হিন্দি চলচ্চিত্র 'সওদাগর' ও সন্দীপ রায় পরিচালিত 'অভিনেত্রী' কে দেখেননি! এ চলচ্চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যকর্ম অবলম্বনে! সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন প্রমুখসহ অনেকেই তাঁর রচনাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গল্প হিন্দি, মারাঠি, রুশ, ইংরেজি, ইতালীয় ভাষায়ও অনূদিত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। লেখালিখির সূচনা বাল্যকালে। প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'মূক', প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মৃত্যু ও জীবন।' দুটোই 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৩৬ সালে। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জোনাকি' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। প্রথম গল্পসংগ্রহ 'অসমতল' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ)। প্রথম উপন্যাস 'হরিবংশ', গ্রন্থাকারের নাম 'দীপপুঞ্জ' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। গল্পগ্রন্থ প্রায় পঞ্চাশটি। উপন্যাসের মধ্যে বিশেষত, 'দীপপুঞ্জ', 'চেনামহল', 'তিন দিন তিন রাত্রি' ও 'সূর্যসাক্ষী', 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকাল থেকেই বিপুল সমাদৃত। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মারা যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস–দীপপুঞ্জ, চেনামহল, তিন দিন তিন রাত্রি, সূর্যসাক্ষী, রূপমঞ্জরী, অক্ষরে অক্ষরে, দেহমন, দূরভাষিণী, সঙগিণী, অনুরাগিণী, সহৃদয়া, গোধূলি, শুক্লপক্ষ, চোরাবালি, পরম্পরা, জলপ্রপাত, কন্যাকুমারী, সুখ দুঃখের ঢেউ, প্রথম তোরণ, তার এক পৃথিবী, সেই পথটুকু, নীড়ের কথা, নতুন ভুবন, জলমাটির গন্ধ, শিখা, অনাত্মীয়া, নতুন তোরণ, সিঁদুরে মেঘ ও নির্বাসন। গল্প সংকলন : অসমতল, হলদে বাড়ি, চড়াই-উৎরাই, বিদ্যুৎলতা, সেতার, উল্টোরথ ও পতাকা। চার দশকে তাঁর রচিত গল্প পাঁচ শতাধিক।

শান্ত-নিস্তরঙ্গ পল্লিজীবন, নগরমুখী মফস্বল শহরের ভাসমান মধ্যবিত্ত এবং মহানগরী কলকাতার সীমায়িত এলাকার অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসগুলোর মূল উপজীব্য। নিজের 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, 'আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করবার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।'

বাংলা ছোটগল্পপরিমণ্ডলে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অনেকটাই অনালোচিত। অথচ তাঁর গল্পের বিষয় ও কাঠামোগত বিন্যাস বাংলা ছোটগল্প তো বটে, বিশ্ব ছোটগল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী। পাঠককে নিমগ্নচিত্তে গল্পপাঠে মুগ্ধতার সাথে ধরে রাখার এক অসামান্য শিল্পশক্তির আধার তাঁর গল্পমালা। শুধু সংখ্যা বিচারে পাঁচ শতাধিক গল্পের শিল্পী-স্রষ্টা মাত্র তিনি নন; তিনি প্রচুর ভালো গল্প লিখেছেন। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তাঁকে নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরের আলোচনা ছাড়া আর কোথাও তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপিত নন। কিংবদন্তিতুল্য নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প নিয়ে স্বতন্ত্র পর্যায়ের বিস্তরায়তন আলোচনা হতে পারে। ৫১টি গল্পগ্রন্থ এবং ৩৮টি উপন্যাসের সার্থক কারিগর তিনি। কর্মজীবনে অনেক ঘাত-অভিঘাত শেষে তিনি 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় যোগদান করেন এবং আমৃত্যু সেখানে কর্মরত ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৬ মাঘ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ (৩০ জানুয়ারি, ১৯১৬)-এ বাংলাদেশের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার রায়পাড়া সদরদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ এবং বিএ পাশ করেন বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। দেশভাগের পর তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের মতো ঘটনা ঘটার সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স একত্রিশ বছর।

গ্রামজীবনের ছবি এবং গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ এক হয়ে গেছে তার সাহিত্যে। মানুষকে তিনি দেখেছেন সত্যিকার মানুষ হিসেবে, একজন সাধারণ মানুষের চোখ দিয়েই তাদের জীবনকাহিনিকে তুলে ধরেছেন নিজস্ব প্রকরণ শৈলীতে। যা সাবলীলভাবে উপস্থিত হয়েছে নির্মোহ ও অনায়াস ঢঙে।

যার মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায় কাহিনি বুননে ও ভাষানির্মাণের পারদর্শিতায়। যা কখনো কখনো কাব্যিকতায় পৌঁছে গেলেও পাঠক আপন করে নেন ভালো লাগার নতুনত্বে। প্রতিটি চরিত্রের মুখে আলাদাভাবে সংলাপে পারমঙ্গমতার পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পোত্তীর্ণের মাপকাঠিতে। অনিবার্যভাবে তিনি কাহিনির গভীরে ডুব দিয়ে আহরণ করেছেন মণি, কাঞ্চন, সোনা। গল্পের শরীরে ব্যবহৃত প্রতীক-উপমা ও রূপকের পরিমিতি বোধ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পের আসনটি নরেন্দ্রনাথের জন্য ধার্য হয়ে যায় নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়নে। উপন্যাস এবং ছোটগল্পে উপস্থাপিত জীবনযাপনের খুঁটিনাটি বিষয়-বৈচিত্র্যের সাবলীল প্রকাশে তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন।

মেসজীবন, একাধিক বাসাবদল, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয় নরেন্দ্রনাথের লেখকজীবন। স্বভাবতই সংখ্যাধিক্যে এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সাহিত্যজগৎ যা সমাজ বাস্তবতা ও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে এক অনবদ্য দলিল রূপে বিবেচ্য। পূর্ববাংলার গ্রামীণ পটভূমিকায় লিখিত তাঁর গল্প উপন্যাস একান্ত স্বাভাবিক আর সভ্য রুচিবোধসম্পন্ন।

দেশবিভাগ-দাঙ্গা-মন্বন্তর যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত অর্থনীতি–সবকিছুই উঠে এসেছে তাঁর লেখনীতে। তবে তিনি যে রূপায়ণে এ প্রসঙ্গকে ছোটগল্পে চিত্রিত করেছেন তা সদর্থক। জীবন কখনো একক দুঃখের কিংবা একক সুখের সমষ্টি নয়, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় জীবনেও সুখের আভাস বিদ্যমান। গল্পের জমিনে ছোপ ছোপ কষ্ট ফুটে ওঠে দুঃখের বিদীর্ণ রেখাপাতে। প্রান্তর তাঁর গল্পভূমি, দুঃসহ জীবনের তাঁর একেকটি সৃষ্টি, সেই দুঃখসমুদ্র থেকে তিনি তুলে আনেন বিন্দুবিন্দু সুখের ছটা। সেই সুখের উদ্ভাস তিনি গল্পের পরিণতিতে এমনভাবে তুলির আঁচড়ে এঁকে দেন, যা পাঠকচিত্তকে জয় করতে কালবিলম্ব হয় না। তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে বাঙালি জীবনের বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যাপিত জীবনের মনোযন্ত্রণা ও টানাপড়েনের চিত্র। একই সাথে তাঁর গল্পে মূর্তমান হয়েছে দেশ, প্রকৃতি, সমাজ ও আটপৌরে মনস্তত্ত্বের বৈচিত্র্য। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা যেকোনো বিচারে একজন সংখ্যালঘু মানুষের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন যুক্তিগ্রাহী ও মর্মস্পর্শীরূপে। তাঁর সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো তাঁর লেখার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব। রক্ত পরম্পরায় সম্মিলনে প্রাণ জমে ওঠানোর আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য হয়ে ওঠে তাঁর লেখনীতে। তাই আড্ডায় প্রাণ জমে ওঠা কথামালায় তরুণদের মধ্যে প্রিয় হয়ে উঠেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৯৬১ সালে কথাসাহিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'আনন্দ পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রপরবর্তী বিবেচনায় বাংলা আধুনিক গল্পে নরেন্দ্রনাথের নামটি স্মরণীয়। •

ফরিদুজ্জামান ॥ কবি

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল গ্যালারি

ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এনই (কে), ১৪, ১৮০, গুলশান অ্যাভেনিউ, ঢাকা

ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী (বাপু) এবং বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই দুই কালজয়ী ব্যক্তিত্বকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে গুলশানস্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল গ্যালারি। ৭ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ যৌথভাবে এই গ্যালারির শুভ উদ্বোধন করেন।

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, January, 2024

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।